ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তা

বইটি হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ কতৃক প্রণীত

খিলাফত প্রকাশনী

খিলাফত প্রকাশনী
এইচ. এম. সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
যোগাযোগ: ০১৬৭ ০০২৬৭০৩

website : www.khilafat.org
e-mail : tahrir.info@gmail.com

প্রথম সংস্করণ : ১৮২৮ হিজরী / ২০০৭ ইং

পবিত্র কুর'আনের অনুবাদ

কুর'আন শুধুমাত্র তার নিজস্ব মূল আরবী ভাষাতেই যথাযথ ভাব ও অর্থ প্রকাশ করে। তাই এটা বোঝা প্রয়োজন যে কুর'আনের যথাযথ অনুবাদ অসম্ভব। বাংলা ভাষাভাষীরা যাতে কুর'আনের বক্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন তাই কুর'আনের অনুবাদ অনেক উলামাই করেছেন। আমরা এই বইয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত ভাবানুবাদ গ্রন্থগুলোর সাহায্য গ্রহণ করেছি।

প্রথম সংস্করণে কোনও ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিতে চেষ্টা করব।

কুর'আরনের আয়াতের অর্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে অক্ষরগুলোকে **বোল্ড** করে দেয়া আছে। হাদীসের অর্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে *ইটালিক* করা হয়েছে।

সূচীপত্র

অধ্যায় ১: ইসলামী আকীদা একটি রাজনৈতিক আকীদা ০৫

১. 'লা ইলাহা ইলালাহ্' এর অর্থ ০৫

2. রাসূলুলাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ০৯

অধ্যায় ২: ইসলামই একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা ১২

1. আল-কুর'আন মানুষের পথ প্রদর্শক ১২

2. ইসলাম সমাজের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা ১৪

3. ইসলাম এসেছে সকল যুগের জন্য ১৬

অধ্যায় ৩: খিলাফত প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরী বিষয় ১৮

১. সমাজে ইসলাম বাস্তবায়নের পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ১৮

২. খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব ২০

৩. খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা এখন সবচেয়ে জরুরী বিষয় ২৩

অধ্যায় ৪: ইসলামে রাজনীতি একটি আবশ্যিক বিষয় ২৭

১. সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব ২৭

২. রাজনীতি হচ্ছে ইসলামের একটি আবশ্যিক বিষয় ২৮

৩. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকা বাধ্যতামূলক ৩২

৪. সঠিক ইসলামী দল বা আন্দোলন-এর ধরণ ৩৩

অধ্যায় ৫: খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি ৩৬

১. সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি ৩৬

২. খিলাফত প্রতিষ্ঠায় রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পদ্ধতি ৩৮

৩. জনমত পরিবর্তন এবং গণআন্দোলন সৃষ্টির গুরুত্ব ৪০

৪. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্যতা ৪২

অধ্যায় ৬: ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীর গুণাবলী ৪৬

১. ইসলামের দাওয়াত বহণকারীর গুণাবলী ৪৬

২. ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর দৈনন্দিন কার্যাবলী ৫০

৩. খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম ৫২

৪. ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর পুরস্কার ৫৬

অধ্যায় ১ – ইসলামী আকীদা একটি রাজনৈতিক আকীদা

১. 'লা ইলাহা ইলালাহ্' এর অর্থ

ইসলামের আকীদা 'লা ইলাহা ইলালাহ্' ইসলামী জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি। বর্তমান সমাজে এই আকীদা চিন্তা-ভাবনা না করে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কিছু বিশ্বাস হিসেবে গৃহীত হচ্ছে। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক অনুসারীরা অর্থাৎ রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর সাহাবীরা (রা.) তাঁদের চিন্তাকে ব্যবহার করে 'লা ইলাহা ইলালাহ্' এর সত্যতা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা (রা.) ইসলামকে বুঝে শুনে নিয়েছিলেন বলেই তাঁরা এর দায়িত্ব বহনে বলিষ্ঠ ছিলেন এবং ইসলামকে পৃথিবীতে একটি বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। আজ যদি আমরা মুসলমানদের পুনর্জাগরণ চাই তাহলে আমাদের মাঝে 'লা ইলাহা ইলালাহ্' এর বাস্তব উপলব্ধি তৈরী করতে হবে।

'লা ইলাহা ইলালাহ্' এরা সত্যিকার মানে বুঝতে হলে আমাদের দুটো জিনিস বুঝতে হবে। প্রথমত: আলাহ্'র অস্তিত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ এবং দ্বিতীয়ত: 'ইলাহ' শব্দের মানে। প্রথমটি অর্থাৎ আলাহ্'র অস্তিত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ খুব সহজ কেননা যে কোন মানুষই একটু চিন্তা করলেই আলাহ্'র অস্তিত্বের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। এজন্য দরকার কেবল বুদ্ধির একটু ব্যবহার। আলাহ্'র অস্তিত্ব প্রমাণে বিপুল বৈজ্ঞানিক গবেষনা কিংবা গভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনার প্রয়োজন নেই।

আমাদের চার পাশের জগত যেমন: মানুষ, জীবজন্তু, চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, গাছপালা, পাহাড় এসব কিছুকে পর্যবেক্ষণ করলে একটা জিনিস স্পষ্টতই বুঝা যায় যে এরা প্রত্যেকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, আকার, জীবনকাল ইত্যাদি নানা দিক থেকে সীমাবদ্ধ এবং নানাভাবেই পরনির্ভরশীল। এই সীমাবদ্ধ দূর্বল সত্তাগুলো কখনোই নিজেরা নিজেদের অস্তিত্বে আনতে পারেনা, অথচ বাস্তবে এরা অস্তিত্বে রয়েছে। অতএব, অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি এদের সবাইকে অস্তিত্বে এনেছেন; তিনিই আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা), একক এবং সর্বশক্তিমান সত্ত্বা, যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সকল কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির আবর্তনে অবশ্যই চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা আলি-ইমরান : ১৯০]

'ইলাহ' বলতে বোঝায় এমন কিছু বা এমন কেউ যার কাছে মানুষ নিজেকে সমর্পন করে এবং যার অনুসরণ করে। যেমন: আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।" [সূরা আল ফুরক্বান : ৪৩]

এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণে জীবনযাপন করে, এজন্যই প্রবৃত্তিকে তাদের ইলাহ বলা হয়েছে।

এছাড়াও আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ফেরাউন তার লোকদের কাছে নিজের ব্যাপারে কী দাবী করতো সে সম্পর্কে বলেন,

"ফেরাউন বললো: 'হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমার জানা নেই।' " [সূরা ক্বাসাস : ৩৮]

এর কারণ হাচ্ছে সে তাদের শাসক ছিল এবং জনগণ তার শাসনের অনুগত ছিলো।

ইহুদী এবং খ্রীস্টানদের ব্যাপারে আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"তারা আলাহ্'র পরিবর্তে তাদের ধর্মযাজক ও সাধুদেরকে নিজেদের প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে।" [সূরা তাওবা : ৩১]

এর কারণ হচ্ছে এসব সাধু ও ধর্মযাজকরা তাদের জন্য বিধান তৈরী করতো এবং কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ তা নির্ধারণ করতো, আর তারাও তা মেনে নিতো।

এ সকল আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আলাহ্'কে একমাত্র 'ইলাহ' হিসেবে গ্রহণ করা মানে কেবন মূর্তিপূজা ত্যাগ করা নয় বরং এ জাতীয় আরো সকল ইলাহ'কে বর্জন করা। অতএব, যদি আমরা 'লা ইলাহা ইলালাহ্' উচ্চারণ করি আর আলাহ্'র উদ্দেশ্যে কিছু ইবাদত-বন্দেগী করি, কিন্তু অন্যদিকে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীকে অনুসরণ করি তাহলে এর মানে হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা ইলাহ হিসেবে নিয়েছি আলাহকে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইলাহ হিসেবে নিয়েছি আমাদের প্রবৃত্তিকে। যদি আমরা রমযানে রোযা রাখি কিন্তু এমন শাসকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করি যারা ফেরাউনের মতো নিজেদের খেয়াল-খুশী দিয়ে আমাদের পরিচালনা করে তাহলে আমরা রোযার ক্ষেত্রে আলাহ্'কে ইলাহ মানছি কিন্তু শাসনকার্যে ইলাহ মানছি ঐ শাসকবর্গকে। এভাবেই, যদি আমরা নামায, রোযা আর যাকাতের ব্যাপারে আলাহ্'কে মানি আর একইসাথে ঐ রাজনীতিবিদদেরও মানি যারা আমাদের জন্য নিজেদের ইচ্ছেমতো আইন-কানুন তৈরী করে তার মানে দাঁড়ায়, আমরা ধর্মীয় ও আধ্যাত্বিক ব্যাপারে আলাহ্'কে ইলাহ মানলেও রাজনৈতিক বিষয়ে ইলাহ মানছি আমাদের রাজনীতিবিদদেরকে। অতএব বোঝা গেল যে, ইলাহ শব্দের মানে অনেক ব্যাপক এবং আলাহ্'কে একমাত্র ইলাহ মানার অর্থ এই ব্যাপক অর্থেই তাকে মানা।

অতএব, একজন মুসলিম আলাহ্'কে নিজের ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করলে তাকে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ: ধর্মীয়, পার্থিব, রাজনৈতিক সব ব্যাপারে আলাহ্'কেই কেবল মানতে হবে। কাজেই, 'লা ইলাহা ইলালাহ্' এর উপর আকীদা বা বিশ্বাস – যা কিনা ইসলামের মূলভিত্তি – তা একই সাথে একটি আধ্যাত্বিক ও রাজনৈতিক আকীদা।

এই আকীদা দাবী করে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সকল ইবাদতের উপযুক্ত এবং কেবল তার সামনেই প্রকাশ করা হবে সকল প্রকার বিনয় ও বশ্যতা। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, বিধান দাতা, ফায়সালাকারী, যখন যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতার অধিকারী, হেদায়েতদাতা, রিযিক দাতা, জীবন দাতা, মৃত্যু দাতা এবং সাহায্যকারী। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যার হাতে সকল রাজত্ব, ক্ষমতা এবং তিনিই যাবতীয় বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

আলাহ্ তা'আলা বলেন,

"তিনিই আলাহ্, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী; ওরা যাকে শরীক করে আলাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।" [সূরা হাশর : ২৩]

"সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান তাঁর জন্যই (সংরক্ষিত)।" [সূরা আ'রাফ : ৫৪]

"কতৃত্বতো শুধুমাত্র আলাহ্'র।" [আল আন'আম: ৫৭]

ইসলামী আকীদা জীবনের সব বিষয়েই চিন্তা ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছে। এটা এমন আকীদা, যা থেকে ব্যাপক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, যে ব্যবস্থা মানুষের আমল-আখলাক ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে উদ্ভুত প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়ে থাকে। ইসলামের এই আকীদা রাষ্ট্র, সংবিধান, সমস্ত আইন-কানুন এবং ঐ সমস্ত বিষয়েরও মূল ভিত্তি, যা এই আকীদা থেকে উৎসারিত হয়। এমনি ভাবে এই আকীদা ইসলামের সমস্ত চিন্তা, আহ্কাম এবং ধ্যান-ধারনারও বুনিয়াদ। মোটকথা, এটা মানুষের বাস্তব বিষয়াদি সমাধান করার আকীদা। এই আকীদা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিধায় এটি রাজনৈতিক আকীদাও বটে। এজন্যই এই আকীদা ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া, এর হেফাযত করা, একে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এর পৃষ্ঠপোষকতা করা, একে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা, অব্যাহত রাখা এবং সরকারের পক্ষ থেকে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবহেলা দেখা দিলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির বাস্তবায়ন দাবী করে। অতএব, ইসলামের রাজনৈতিক আকীদা হচ্ছে পরিপূর্ণ ও ব্যাপক যা জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই বেষ্টন করে। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।" [সূরা নাহল : ৮৯]

এসব কিছু থেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের এই মূল কালেমাটি একইসাথে আধ্যাত্বিক এবং রাজনৈতিক। একদিকে এটা আলাহ্'র সাথে মানুষের সম্পর্কের রূপরেখা দেয় এবং ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে জান্নাতে যাবার পথ দেখায় আর অন্যদিকে

একই সাথে আলাহ্ ছাড়া আর সব নেতৃত্ব-কতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ফেরাউনের মতো শাসকদের উৎখাতের ডাক দেয়। এই কালেমা অত্যাচারী, খোদাদ্রোহী, জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে তাদেরকে উৎখাতের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় আলাহ্'র একক কতৃত্ব তথা 'লা ইলাহা ইলালাহ্'র সামগ্রিক অর্থের বাস্তবায়ন দাবী করে।

ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে যে ব্যক্তিগত ইবাদত, সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সমস্ত ব্যাপারে আর সব মিথ্যা ইলাহ'কে প্রত্যাখ্যান করে আলাহ্'কেই (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) একমাত্র 'ইলাহ' বলে মানতে হবে এবং তাঁর কাছে থেকে আসা জীবন ব্যবস্থা ইসলামের মাধ্যমেই সব কিছু পরিচালনা করতে হবে। রাসূলুল-াহ্ (সাঃ) এই একটি মাত্র বাক্য নিয়েই মক্কার পুরো নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। মক্কার কাফেররা এই কালেমার অর্থ বুঝতে পেরেছিল বলেই এটাকে তাদের কতৃত্বের অবসান হিসেবে দেখেছিল এবং সর্বশক্তি দিয়ে এই কালেমার প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করতে চেয়েছিল। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) তাদের বলেছিলেন - *"আমার এক হাতে সূর্য, অন্য হাতে চন্দ্র এনে দিলেও এর প্রচার বন্ধ হবে না।"* আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় আবু জেহেলসহ সমস্ত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তার কাছে এসে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে শেষ আপোষ-রফা করতে চাইলে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) তাদের বলেন, *"তোমরা আমাকে একটা মাত্র কথা দাও, যার ফলে তোমরা আরব জাহানের অধিকর্তা হয়ে যাবে এবং অনারব বিশ্ব তোমাদের বশ্যতা মেনে নেবে।"* আবু জেহেল তখন বললো; "বেশ! তোমার পিতার কসম এরূপ হলে একটা কেন আমরা দশটা কথা দিতে রাজী।" তিনি বললেন : *"তা হলে তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইলালাহ'। তিনি (আলাহ্) ছাড়া আর যাদের উপাসনা তোমরা করো তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করো।"* একথা শুনে তারা এই বলে চলে গেলো যে, "হে মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি সব ইলাহ'কে এক ইলাহে পর্যবসিত করতে চাও।" কেননা কাফের নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলো যে এই বাণীর কছে নিজেদের সমর্পণ করলে তাদের বর্তমান কতৃত্ব আর থাকবে না বরং সব বিষয় ইসলামের কতৃত্বে পরিচালিত হবে। আর তাদের প্রতি রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর এই আহ্বানের মাধ্যমে এটাও সুস্পষ্ট যে এই কালেমার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আরব অনারব তথা সমগ্র বিশ্বের উপর ইসলামের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রতি তাঁর পত্রেও কালেমার এই আহ্বানের মর্মার্থ সুস্পষ্ট। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কাছে তিনি (সাঃ) লিখেছেন, *"আমি আপনাকে সেই একক অদ্বিতীয় উপাস্যের দিকে আহ্বান করছি। আপনি আমার আনুগত্য স্বীকার করুন। আমি আপনাকে এবং আপনার বাহিনীসমূহকে মহান আলাহ্'র দিকে আহ্বান করছি।"* রোম সম্রাটের কাছে তিনি লিখেন, *"আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করে নিন, নিরাপত্তা লাভ করবেন।"* পারস্য সম্রাটকেও অনুরূপ পত্র লিখেন। মিশরের শাসক মুকাওকিসকে লিখেন, *"আমি তোমাকে আলাহ্'র একত্বে বিশ্বাসের দাওয়াত দিচ্ছি। যদি তুমি স্বীকার করে নাও, তবে এ হবে তোমার সৌভাগ্য, আর যদি তুমি তা প্রত্যাখ্যান কর তবে এ হবে তোমার দূর্ভাগ্য।"* বাহরাইনের শাসক মুনযিরকে লিখেন, *"যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তোমার হাতে যা কিছু

আছে আলাহ্ তা তোমারই হাতে ছেড়ে দেবেন। জেনে রেখো, অচিরেই আমার দ্বীন ভূ-ভাগের সেই প্রান্ত অবধি পৌঁছবে যতদূর ঘোড়া ও উট পৌঁছাতে পারে।"* সিরিয়ার বাদশাহ্কে লিখেন *"আমি আপনাকে লা শরীক আলাহ্'র প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আপনি যদি ঈমান আনেন, তবে আপনার রাজত্ব বহাল থাকবে।"* ওমানের রাজন্যদ্বয়কে লিখেন, *"...যদি তোমরা আমার আহ্বানকে অস্বীকার কর তবে অচিরেই আমার নবুয়্যাত তোমাদের রাজত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।"* এভাবে তিনি তৎকালীন পুরো বিশ্বকে এই বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলামের কতৃত্বকে মেনে নেয়ার জোরালো আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আজ আবার মুসলিম উম্মাহ'কে পুনর্জাগরিত করতে হলে আমাদেরকে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর উদাহরণ অনুসরণ করে 'লা ইলাহা ইলালাহ্'কে আমাদের জীবনের ভিত্তি বানানো এবং এই কালেমার ভিত্তিতেই শাসন ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এই সংগ্রাম অবশ্যই হতে হবে সুসংগঠিত যা শাসন কতৃপক্ষের পাঁজরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে, তাদেরকে সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে জনগণের সামনে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করবে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে ঐ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হতে এবং প্রতিবাদী হাত ও আঙ্গুলের সংখ্যা এমনভাবে বাড়াবে যেটা শাসন কর্তৃপক্ষের গলার চারপাশে চেপে বসে তাদের শ্বাসরুদ্ধ করে তাদের ক্ষমতা পুরোপুরি শেষ করে দিবে। এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে শাসন কতৃপক্ষের পক্ষ হতে ক্ষুধা, দারিদ্র, কারাবাস, নির্যাতন ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সেই সাথে প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের সময়, প্রচেষ্টা, সম্পদ এমনকি জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য।

২. রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য

'লা ইলাহা ইলালাহ্' এর উপর বিশ্বাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না এর সাথে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ্'–অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (সাঃ) আলাহ্'র রসূল' এটি যোগ করা না হয়। কেননা তাঁর মাধ্যমেই 'লা ইলাহা ইলালাহ' এর বাণী আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। একজন মুসলমানকে অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠতম ও সর্বশেষ নবী হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর নবুয়্যাত তথা তাঁকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে।

একটি সুনির্দিষ্ট মিশন দিয়ে আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর রাসূল (সাঃ) কে মানব জাতির কাছে পাঠিয়েছেন, আর তা হলো আলাহ্র প্রেরিত জীবন ব্যবস্থা – ইসলামকে পৃথিবীতে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত আর সব বাতিল জীবন ব্যবস্থার উপর অধিষ্ঠিত করতে, তাদের শক্তিকে খর্ব করতে ও ইসলামকে একমাত্র বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এ উপর আলাহ্'র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ আল-কুর'আন তাঁর মিশনকে নিম্নের আয়াতদ্বয়ে স্পষ্ট বলে দিচ্ছে:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সত্যসম্বলিত গ্রন্থ দিয়ে যাতে করে আলাহ্ তোমাকে যা দেখিয়েছেন তা দিয়ে তুমি মানবজাতিকে শাসন করতে পারো।" [সূরা নিসা : ১০৫]

এবং

"তিনিই আলাহ্, যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) সহ, যাতে করে তা আর সব দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) এর উপর বিজয় লাভ করতে পারে যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" [সূরা তাওবা : ৩৩]

ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুলাহ (সাঃ) বলেন, *"আমি (আলাহ্'র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা "আলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ (সাঃ) আলাহ্'র রাসূল" – একথার স্বীকৃতি দেয় এবং নামাজ কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে। অতএব, যদি তারা তা করে তবে তাদের জীবন ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ, তবে যেটা আলাহ্'র আইন (অর্থাৎ শারী'আহ্ লঙ্ঘনে প্রাপ্য শাস্তি) তা ব্যতীত। আর তাদের হিসাব নিকাশ আলাহ্'র কাছে।" (বুখারী)*

মানবজাতির প্রতি রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর বৃহত্তর আহ্বান ছিল এই যে, তারা যেন আলাহ্'র সার্বভৌমত্বে কোন প্রকার শরীক না করে আর পুরোপুরি আলাহ্'র কতৃত্বকে মেনে নেয়। এর অর্থ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতি তাঁকে স্বীকার করে নিতে এবং তাঁর আনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলামকে মেনে নিতে বাধ্য। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে (আমি) মুহাম্মদ রাসূলুলাহ্ (সাঃ)-এর জীবন! বর্তমান মানব গোষ্ঠীর কোন ইহুদী বা নাসারা আমার আবির্ভাবের সংবাদ শোনার পর যে দ্বীন নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করলে সে নিশ্চিতই জাহান্নামীদের
অন্তর্ভূক্ত হবে।" (মুসলিম)

অর্থাৎ, তাঁর আগমনের পর থেকে শুরু করে সব যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্যই তাঁকে একমাত্র পদপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা এবং ইসলামের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতির সকল কর্মকান্ড পরিচলনা করা আলাহ্'র পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। কেননা, রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয় যেন তাঁর প্রদর্শিত পথে আলাহ্'র পূর্ণ আনুগত্য করা হয়। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আমি রাসূল এ জন্যই প্রেরণ করেছি যে, আলাহ্'র নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে।" [সূরা নিসা : ৬৪]

এবং

"আলাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার থাকবে না।" [সূরা আল আহযাব : ৩৬]

রাসূল (সাঃ) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটা নয় যে, কিছু মানুষ তাদের ব্যক্তি জীবনের কিছু ব্যাপারে তাকে মেনে চলবে বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, সমস্ত পৃথিবীর উপর ইসলামকে একমাত্র বিজয়ী ও কতৃত্বশীল ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাতে আর সব ব্যবস্থার অস্তিত্বই না থাকে অথবা সেগুলো থাকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার অধীনে লাঞ্ছিত অবস্থায়। এটাই ছিল রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর নবুয়্যাতী মিশন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই মিশনের পূর্ণতাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। তাঁর পবিত্র সীরাতের দিকে তাকালেই আমরা দেখবো তিনি কেবলমাত্র হেদায়েত তথা ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং মদীনায় একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে এবং চতুর্দিকের সব কাফের মুশরিক শক্তি ও জীবনব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে ইসলামকে তখনকার পৃথিবীতে একমাত্র বিজয়ী ও কতৃত্বশীল জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন যা চালু রেখেছিলেন তাঁর উত্তরসূরী খুলাফায়ে রাশেদীনও।

অধ্যায় ২ – ইসলামই একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা

১. আল-কুর'আন মানুষের পথ প্রদর্শক

মানুষের কাছে প্রতিটি বিষয়ে আলাহ্'র আদেশ সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক যার মাধ্যমে তারা জীবনের সব বিষয়ে আলাহ্'র পথ-নির্দেশনাগুলো জানতে পারবে। আলাহ্'র কাছ থেকে আগত এই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাটির লিপিবদ্ধ রূপই হচ্ছে আলাহ্'র কিতাব আল-কুর'আন। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"এ গ্রন্থ (আল-কুর'আন) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আলাহ্'র নিকট হতে অবতীর্ণ।" [সূরা আহক্বাফ : ২]

"কুর'আন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট প্রমান।" [সূরা জাসিয়া : ২০]

আল-কুর'আন যে আলাহ্'র নিকট হতে আগত গ্রন্থ তার প্রমান আল-কুর'আন নিজেই। কেননা যাদের কাছে আল-কুর'আন নাযিল হয়েছে তাদের ভাষা ছিল আরবী, আর যে যুগে এটা নাযিল হয়েছিল তা ছিল আরবী ভাষার চরম উৎকর্ষের যুগ। খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকরা আরবী ভাষায় অনুপম সাহিত্য ও কবিতা সৃষ্টি করে চলছিল। এমনি একটা সময়ে নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর কাছে আল-কুর'আন নাযিল হয়ে আরববাসীর প্রতি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো এই বলে যে,

"যদি আমার দাসের [মুহাম্মদ (সাঃ)] প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন করো।" [সূরা বাক্বারা : ২৩]

এবং

"তারা কি বলে যে, সে [মুহাম্মদ (সাঃ)] এটি রচনা করেছে? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা আনয়ন কর এবং আলাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পারো আহ্বান করো। যদি তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখ, এ (কুর'আন) আলাহ্'রই নিকট হতে অবতীর্ণ।" [সূরা হুদ : ১৩-১৪]

এবং

"বল, যদি এ কুর'আনের অনুরূপ কুর'আন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বীন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা অনুরূপ কুর'আন আনয়ন করতে পারবে না।" [সূরা বণী ইসরাঈল : ৮৮]

আল-কুর'আনের এসব উপর্যুপুরি চ্যালেঞ্জের পরও শ্রেষ্ঠতম আরবী কবি সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়েও এর অনুরূপ একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি যা প্রমাণ করে

দিয়েছে যে এ কুর'আন কোন আরবের প্রতিভা থেকে উদ্ভুত কোন গ্রন্থ নয় বরং এ হচ্ছে মহাপ্রজ্ঞাময় আলাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রেরিত গ্রন্থ। আর এদিক দিয়েও আল কুর'আন একটি মুজিযা বা আলৌকিক গ্রন্থ যে, এটি কেবল তাক লাগিয়ে দেয়া উচ্চতম শিখরের একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী আরবী সাহিত্য মাত্র নয় বরং বাস্তব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান সম্বলিত গ্রন্থ যার সমকক্ষতা কোন যুগেই কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ, তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও প্রয়োজন, তাদের সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের সাথে উদ্ভুত সকল প্রয়োজন ও সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান দেয় আল-কুর'আন। মানবজীবনের সাথে সংশিষ্ট কোন একটি বিষয়ও আল-কুর'আন বাদ দেয়নি। প্রতিটি বিষয়েই আল-কুর'আন প্রত্যক্ষ আদেশ জানিয়ে দিয়েছে অথবা ঐ বিষয়ে আলাহ্'র আদেশ বের করে নেয়ার প্রায়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"এ কুর'আন সর্বশ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ করে।" [সূরা বণী ইসরাঈল : ৯]

"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।" [সূরা নাহল : ৮৯]

আল-কুর'আন শুধু একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হওয়ার তাত্ত্বিকতার মধ্যেই তার মুজিযাকে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বাস্তবে এটি সত্যিকারভাবেই এতে বর্ণিত জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে আলোকিত করেছিল। এমনকি তাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি ও মানবজাতির শিক্ষকে পরিণত করেছিল; দূর্বল ও হীন অবস্থা থেকে তুলে এনে তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছিল। যে আরব জাতি কুর'আন নাযিলের পূর্বে সব ধরনের অত্যাচার, অনাচর, বংশীয় ও গোত্রীয় হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' যুগ পার করছিল তারাই আল-কুর'আনের স্পর্শে এবং এতে প্রদর্শিত সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার ধারক হয়ে গেলো। ঐ সভ্যতা পরবর্তী চৌদ্দশ বছর পৃথিবীকে ন্যায়ের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে গেছে। এটা ছিল আল-কুর'আনের বাস্তব এবং ব্যবহারিক এক মুজিযা, ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে যার সাক্ষী। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আলিফ লাম রা। এ কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারো; তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ্য।" [সূরা ইব্রাহীম : ১]

আজকের মুসলিমদের বাস্তবতার দিকে তাকালে আবারো এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় তাদের নিমজ্জিত দেখা যাচ্ছে। আল-কুর'আনের শাসনকে সমাজে বাস্তবায়িত না করায় আজ তাদের সমাজ চলছে তাদের চরম শত্রু কাফেরদের কাছ থেকে আসা জীবনব্যবস্থা দিয়ে। এর ফলে একদিকে তারা পৃথিবীতে হারিয়েছে নেতৃত্ব ও গৌরবের আসন অন্যদিকে নিজ নিজ সমাজে হচ্ছে জুলুম ও লাঞ্ছনার শিকার। এর একটিমাত্র কারণ হচ্ছে তারা

পৃথিবীতে তাদের সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আল-কুর'আনকে একমাত্র পথ-নির্দেশনা ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে না নিয়ে মাত্র অল্প কিছু বিষয়ে এর ব্যবহারকে সংকুচিত করেছে আর বাকী সব ক্ষেত্রে চলছে অন্যসব জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়ন। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এই বলে যে,

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর? অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন এরা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।" [সূরা বাক্বারা : ৮৫]

২. ইসলাম সমাজের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা

যে কোন সমাজেই মানুষের সামগ্রিক কাজকর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কোন একটি নিয়ম বা ব্যবস্থা থাকে। যেমন, তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে হবে, সমাজে সম্পদের বন্টন কী প্রক্রিয়ায় হবে, কোন কোন কাজকে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং তার কী শাস্তি হবে ইত্যাদি। একটি সামগ্রিকভাবে উন্নত সমাজ তৈরি করতে হলে এমন একটি ব্যবস্থা দিয়ে সমাজ পরিচালনা করতে হবে যা সবদিক দিয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ। মানুষের সমাজের জন্য ঐ ব্যবস্থাটাই হবে সবচেয়ে উপযোগী যেটা মানুষের স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা দেয় এবং মানবজাতির সহজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে পুরোপুরি খাপ খায়। যে ব্যবস্থা আলাহ্'র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং যে ব্যবস্থার নিয়ম-কানুনগুলো মানুষের সহজাত চাহিদাগুলোকে অস্বীকার করে অথবা একটা চাহিদাকে অনেক গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্য চাহিদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরূপ কোন ব্যবস্থা মানুষের দুঃখ-দুর্দশাই কেবল বাড়াবে। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যেটা একদিকে মানুষের স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা দেয় এবং অপরদিকে সেই স্রষ্টার কাছ থেকে আগত একটি জীবন ব্যবস্থাও দেয় যা মানব প্রকৃতির সথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমানের সাথেই এই সত্যটি উপস্থাপন করেছে যে আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হচ্ছেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা হতে সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হচ্ছেন মানবজাতির স্রষ্টা তাই কেবল তাঁর পক্ষেই যথার্থভাবে মানব জাতির সব ধরণের প্রয়োজন ও সুবিধা অসুবিধাগুলো জানা সম্ভব এবং সম্ভব এর সমাধানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবণ ব্যবস্থা প্রদান করা। ইসলাম যেহেতু এসেছে আলাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কাছ থেকে তাই একমাত্র এটিই মানুষের সমাজের জন্য একমাত্র সঠিক ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের সবগুলো মৌলিক ও সহজাত চাহিদাকে স্বীকার করে নেয় এবং এমন একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেয় যা সমাজে পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখে প্রত্যেককে নিজ নিজ চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। ফলশ্রুতিতে, একদিকে ব্যক্তির চাহিদাও পূর্ণ হয় আবার সমাজেও পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করে।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।" [সূরা নাহল : ৮৯]

সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব বিধি-বিধানই ইসলাম বলে দেয়।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" [সূরা আল মায়িদা : ৩]

ইসলামের বিধানগুলো ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এসবের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম কানুন বলে দেয় অপরদিকে যুগ-সমস্যার কারণে উদ্ভুত প্রতিটি নতুন বিষয় কিভাবে বের করতে হবে সে ব্যাপারেও পূর্ণ দিক নির্দেশনা দেয়। একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে নামাজের জন্য কীভাবে পবিত্র হবে, পরিবারিক জীবনে বাকীদের সাথে তার সম্পর্ক কী হবে, তাদের প্রতি তার দায়িত্ব কী হবে, তার সম্পদগুলো কীভাবে বন্টিত হবে, সামাজিক জীবনে তার চলাফেরা কী রকম হবে, নারী-পুরুষ সম্পর্কের নিয়ম কি হবে, বিয়ে-শাদীর নিয়ম কি হবে, উপার্জনের বৈধ উপায় কোনগুলো আর কোন পথগুলো অবৈধ, অর্থনৈতিক জীবনে কোন কোন ব্যবসাগুলো অনুমোদনযোগ্য এবং কোনগুলো নয়, রাজনৈতিক জীবনে শাসকের জুলুমের ক্ষেত্রে জনগণের দায়িত্ব কী, কোন কোন বিষয়গুলো পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন ব্যবস্থা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, কীভাবে শাসক নিয়োগ হবে, রাষ্ট্রের আয়ের উৎস কী হবে, জনগণের মাঝে এর বন্টন কীভাবে হবে, কেউ চুরি বা দূর্নীতি করলে তার শাস্তি কী হবে, শিক্ষানীতি, বিচার ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি ইত্যাদি কি হবে এসব কিছুরই খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে ইসলামে এবং এভাবেই তা পালনে মুসলমানরা সামষ্টিকভাবে বাধ্য। যেমন **"সালাত কায়েম কর"** একটি ইবাদতের আদেশ দিচ্ছে; **"আলাহ্ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন"** অর্থনীতি সম্পর্কিত আদেশ দিচ্ছে **"পুরুষ বা নারী যে কেউ চুরি করলে হাত কেটে দাও"** অপরাধের শাস্তি বলে দিচ্ছে; *"বাস করার জন্য একটি ঘর, আব্রু রক্ষার জন্য এক টুকরা কাপড় আর খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটি এবং একটু পানি; এগুলোর চেয়ে জরুরী কোন অধিকার আদম সন্তানের থাকতে পারে না।" (তিরমিযী)* জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার শিখায়; *"তিনটি বিষয়ে সকল মুসলমান সমানভাবে শরিক- আগুন, পানি ও চারনভূমি"(হাদীস)*-গণমালিকানাধীন সম্পদকে সুনির্দিষ্ট করে দেয় ইত্যাদি।

এভাবে ইসলাম পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সকল বিষয়কে বেষ্টন করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা দেয়। মানবজাতির জন্য ইসলামই একমাত্র বিশুদ্ধ আদর্শ। তাছাড়া ইসলাম হচ্ছে এমন এক বিশ্বজনীন মতাদর্শ যা মানব প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম শুধুমাত্র মানুষের জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের উপায়ই বলে দেয়না, বরং এগুলোকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করে যাতে এগুলো হয় পরস্পর ভারসাম্যপূর্ণ। অর্থাৎ ইসলাম মানুষকে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন স্বাধীন অবস্থায়ও ছেড়ে দেয়না, আবার পরোপুরি দমিয়েও রাখেনা অথবা এক প্রবৃত্তিজাত চাহিদাকে অপর প্রবৃত্তিজাত চাহিদার উপর চাপিয়েও দেয়না। এটি এমন এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, যা মানব জীবনের সকল বিষয়কে সুসংগঠিত করে দেয়। তাই একমাত্র ইসলামই মানুষকে সত্যিকার মানুষের মর্যাদা দিয়ে তার সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম।

৩. ইসলাম এসেছে সকল যুগের জন্য

ইসলামের প্রয়োগ কোন যুগ বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং ইসলাম সকল যুগেই মানুষের জন্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। এটা এজন্য যে, ইসলাম মানবীয় চাহিদাগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য এসেছে আর এই চাহিদাগুলো কোন যুগের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

মানুষের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে তার সুনির্দিষ্ট কিছু মানবীয় চাহিদা রয়েছে যেগুলোর উপর পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকা ও জীবন-যাপন প্রক্রিয়া নির্ভর করে। এই চাহিদাগুলো পূরণের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ ও এদের ক্রমোন্নতির পিছনে সে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায় যাতে করে এসব চাহিদা পূরণের উপায় সহজ থেকে সহজতর হয়। আদিম মানুষ তার উপায়-উপকরণগুলোকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উন্নত করতে করতে আজকের এই উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন অবস্থায় এসেছে যেখানে রয়েছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, খাদ্য-বস্ত্র বাসস্থানের উন্নততর সংস্থান, বিনোদনের নানা উপকরণ, বস্তু-জগত সম্পর্কে আরো ব্যাপক জ্ঞান ইত্যাদি। এসবই হয়েছে একটি মাত্র কারনে; তা হলো মানবীয় চাহিদা ও প্রয়োজনগুলো মিটানোর সহজতর উপায় অনুসন্ধান আর এ চাহিদা ও প্রয়োজন সব যুগে সব মানুষেরই ছিলো। এসব চাহিদার ব্যাপারে তাদের মাঝে কোন মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পার্থক্য কেবল এই যে, বিভিন্ন যুগে মানুষের এই চাহিদা পূরণের উপায়-উপকরণগুলো বিভিন্ন ছিলো যা একটি উপকরণগত পার্থক্য মাত্র। কাজেই সহজাত চাহিদাগুলোর ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ একই অবস্থায় রয়েছে।

ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে মানুষের সব ধরণের জৈবিক চাহিদাকে সর্বোচ্চ সাঠিক উপায়ে সুশৃংখল করার জন্য। ইসলাম যে ব্যবস্থা বা বিধি-বিধান দেয় তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে মানুষের জৈবিক-চাহিদা পূরণের পদ্ধতিগুলোকে এমনভাবে নিয়মবদ্ধ করা যাতে করে এর ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা তৈরী না হয়। ইসলাম এসব চাহিদা

পূরণের বৈধ পদ্ধতিকে সুনির্দিষ্ট করেছে, উপকরণকে নয়। যুগের কারনে যে উপকরণ গত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে তাতে ইসলামের বিধি-বিধান প্রয়োগে কোনই বাধা সৃষ্টি হয় না। ইসলাম কোথাও বলেনি যে একস্থান থেকে আরেক স্থানে যেতে হলে উটের পিঠে করে যেতে হবে, তাই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার জন্য গাড়ী, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ যাই ব্যবহার করা হোক না কেন সবই একই ব্যাপার।

আসলে মানুষ যতদিন 'মানুষ' থাকবে ততদিনই তার মানবীয় সব চাহিদা ও প্রয়োজন অপরিবর্তিত থাকবে। একইভাবে সেগুলোকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনার জন্য একটা ব্যবস্থাও লাগবে সবসময়ই। যেহেতু ইসলাম আলাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আসা একটি ব্যবস্থা তাই কেবল এটিই পারবে উপকরণ নির্বিশেষে সব যুগে মানুষের চাহিদাগুলোকে এবং চাহিদা থেকে উৎপন্ন সামাজিক সমস্যাগুলোকে সবচেয়ে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে। ইসলাম তাই সব যুগের জন্য এবং সকল সময়ের জন্য।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" [সূরা আল মায়িদা : ৩]

"এবং তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছে, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেউই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।" [সুরা আল আন'আম : ১১৫]

অধ্যায় ৩ – খিলাফত প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরী বিষয়

১. সমাজে ইসলাম বাস্তবায়নের পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

যেহেতু ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনের জন্য একটি সামগ্রিক মতাদর্শ তাই রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালনা এর অবিচ্ছেদ্য অংশ, কেননা শাসন ব্যবস্থা ছাড়া কোন সমাজই টিকে থাকতে পারে না। ইসলাম মুসলমানদের আদেশ করে যেন তারা একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যা পরিচালিত হবে ইসলামী আইন-কানুন দিয়ে। শাসন ব্যবস্থা ও শাসন কতৃত্ব নিয়ে আল-কুর'আনে অনেক অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যাতে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন আলাহ্‌র নাযিলকৃত বিধি বিধান দিয়েই কেবল শাসন পরিচালনা করে।

আলাহ্ তা'আলা বলেন,

"আর আপনি আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" [সূরা আল মায়িদা : ৪৮]

"আর আপনি আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; যেন তারা আপনার নিকট আল্লাহ্'র প্রেরিত কোন বিধান থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" [সূরা আল মায়িদা : ৪৯]

"আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই তো কাফের।" [সূরা আল মায়িদা : ৪৪]

"আলাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই তো যালিম।" [সূরা আল মায়িদা : ৪৫]

এবং

"আলাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই তো ফাসেক।" [সূরা আল-মায়িদাঃ ৪৭]

তিনি (সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা) আরো বলেন,

"কিন্তু না, তোমার প্রভূর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার (মুহাম্মদ (সাঃ)) উপর ন্যস্ত না করে।" [সূরা নিসা : ৬৫]

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আলাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তাহলে তোমরা আনুগত্য কর আলাহ্'র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে কতৃত্বশীল; (আর) যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও তবে তা উপস্থাপন কর আলাহ্ ও রাসূলের নিকট।" [সূরা নিসাঃ ৫৯]

উপরোক্ত আয়াতগুলোর পাশাপাশি আরো অনেক আয়াতেই শাসন ব্যবস্থা ও শাসন কতৃপক্ষ সম্পর্কিত আদেশ রয়েছে। এছাড়াও, আরো অনেক অনেক আয়াতে রয়েছে শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির বিশদ বিবরণ। এরকম শত শত আয়াতের মাধ্যমে এবং এর পাশাপাশি আরো অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণ, সেনাবাহিনী, অপরাধ, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে আইনগত দিক নির্দেশনা পাই। এসব কিছুই নাযিল হয়েছে এসব দিয়ে শাসন করার জন্য; এর বিধানগুলো বাস্তবায়ন এবং তা প্রতিপালিত হবার জন্য। সত্য হচ্ছে এই যে, এসবই স্বয়ং রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর সময়ে এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুসলিম শাসকবৃন্দের মাধ্যমে বাস্তবে অনুসরণ করা হতো এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত ছিলো। এটা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা শাসন কতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে পুরো উম্মাহ্, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে পরিব্যপ্ত। উপরোক্ত আলোচনা এটাও প্রমাণ করে যে, ইসলামী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার অনুমতি নেই। ইসলাম এর স্বরূপে জীবন্ত থাকতে পারে না যদি না তা একটি বাস্তবায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থার আকারে না থাকে। ইসলাম হচ্ছে একটি সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা এবং একটি মতাদর্শ আর শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে এর একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ। ইসলাম প্রতিটি বিষয় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি বলে দিয়েছে, আর জনসাধারনের মাঝে ইসলামের বিধানসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলাম নির্ধারিত একমাত্র বৈধ পদ্ধতি হচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে তা করা। ইসলাম তার পূর্ণরূপ নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে না যদি তার হাতে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকে যা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে বাস্তবায়িত করে।

প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র ছাড়া সমাজে যে কোন ব্যবস্থার প্রয়োগই অসম্ভব। পৃথিবীতে বর্তমানে যে ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়িত আছে যথা: পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র, তা রাষ্ট্রীয়ভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই প্রসার লাভ করছে। সাম্রাজ্যবাদী কাফের শক্তিগুলো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ব্যবহার করেই মুসলিম ভূমিগুলো দখল করছে কিংবা মুসলিম ভূমিগুলোতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক কতৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তাদেরকে উৎখাত করতে হলে ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আরেকটি সংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব। একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিই কেবল পারবে মুসলিম ভূমিগুলোতে কাফের রাষ্ট্রগুলোর সব ধরণের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে। তাছাড়া শুধু বহিঃশক্তির প্রতিরোধ নয়, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়কে ইসলামী ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালনার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অত্যাবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ: ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী জনগণের সম্পদ যেমন – তেল, গ্যাস, কয়লা এসবকে ব্যক্তি বা কোম্পানী মালিকানায় নেয়া যাবে না, অথচ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে এসবকে ব্যক্তি মালিকানায় নিতে কোন বাধা নেই। তাই যতক্ষণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী না হচ্ছে তার আগে এ ব্যাপারে ইসলামী মূলনীতি

প্রয়োগ সম্ভব নয়। এভাবেই সমাজের প্রতিটি স্তরে যথার্থভাবে ইসলামকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব যদি এবং কেবলমাত্র যদি রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র হয়; কেননা তখন সম্ভব হবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে ইসলামী শিক্ষা নীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো, কাফেরদের অর্থনীতি ত্যাগ করে ইসলামী অর্থনীতির প্রণয়ন, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলামবিরোধী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে সমূলে উৎপাটন ইত্যাদি। এভাবে ব্যক্তি জীবন কিংবা সমাজ জীবন কোথাও ইসলামী জীবন যাপনের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা এবং সকল ক্ষেত্রে আলাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সকল আদেশ নিষেধকে মেনে চলা সম্ভব হবে।

আসলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামকে বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিটি ইসলাম-ই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাই রাসূলুলাহ (সাঃ) তাঁর নবুয়্যাত জীবনের প্রথম থেকেই এ লক্ষ্য অর্জনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। মক্কী জীবনের ১৩টি বছর তিনি কেবল ব্যক্তি পরিবর্তন করে তাদের মুসলিম বানাননি, বরং মক্কায় একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সীরাতে এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অতঃপর, আলাহ্'র ইচ্ছায় মদীনায় খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার মাধ্যমে ঐ সমাজে ইসলামের বিধি-বিধানগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় এবং খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পরবর্তী তেরশ বছর এ পদ্ধতিতেই সমাজে ইসলাম বাস্তবায়িত ছিলো। ঐ রাষ্ট্রব্যবস্থা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছিল, অন্যদিকে কাফের শক্তির দখলদারিত্ব থেকে রক্ষা করেছিল মুসলমানদের ভূখন্ড ও তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান।

২. খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব

যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আহ্কামে শারি'আহ্'র প্রয়োগ ও ইসলাম প্রচারের জন্য দায়িত্বশীল তাই হচ্ছে খিলাফত। ইসলামী শাসনব্যবস্থাকেই খিলাফত নামে অভিহিত করা হয়। সারাবিশ্বের সমস্ত মুসলমানের উপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। আলাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আদেশকৃত অন্যান্য ফরযের মতোই খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফরয কাজটাও অবশ্য পালনীয়, এ ব্যাপার কোন পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুযোগ নেই। সমষ্টিগতভাবে মুসলমানদের এই দায়িত্বের প্রতি উদাসীন থাকা কিংবা একে উপেক্ষা করা কবীরাহ গুণাহ যা আলাহ্'র কিতাব, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ, সাহাবাদের (রা.) ইজমা এবং শ্রেষ্ঠতম আলেমদের বক্তব্যে সুস্পষ্ট।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) রাসূল (সাঃ) কে মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ তিনি যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী শাসন করতে বলেছেন; অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁকে (সাঃ) এই আদেশ দিয়েছেন। আলাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল (সাঃ) কে বলেন,

"আর আপনি আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।"
[সূরা আল মায়িদা : ৪৮]

"আর আপনি আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তা দিয়ে তাদের মাঝে ফায়সালা করুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; যেন তারা আপনার নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত কোন বিধান থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।"
[সূরা আল মায়িদা : ৪৯]

উপরোক্ত আয়াতগুলো শুধু রাসূল (সাঃ) এর প্রতি সীমাবদ্ধ নয়। উক্ত আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে আলাহ্'র আইন বাস্তবায়নের আদেশ দেয়া হয়েছে। আলাহ তা'আলা সুস্পষ্ট আদেশ করেছেন যে সমাজে মানুষের সমস্ত বিষয়াদি যেন তাঁর নাযিলকৃত বিধান মত পরিচালনা করা হয় এবং এটা করতে হলে নিশ্চিতভাবেই একজন শাসক বা খলীফা থাকতে হবে যে সত্যি সত্যি এটা বাস্তবায়ন করবে। ইসলামী শাসক তথা খলীফা ছাড়া ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেহেতু আলাহ্'র আদেশ অনুসারে সমাজে ইসলামী বিধি বিধান বাস্তবায়ন একটি ওয়াজিব (অবশ্যকর্তব্য) বিষয় এবং শারী'আহ্ মূলনীতি হলো যে "যা ছাড়া কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না তাও ওয়াজিব" অতএব খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং খলিফা থাকাও ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় একটি বিষয়।

রাসূলুলাহ (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে তার কাঁধে (কোন খলীফার) বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) নেই তবে তার মৃত্যু হচ্ছে জাহেলী যুগের মৃত্যু" (মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

"বনী ইসরাইলকে শাসন করতেন নবীগণ, যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোন নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন। তাঁরা (রা) (সাহাবীরা) জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ দেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা (তাদের) একজনের পর একজনের বায়'আত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে।" (বুখারী, মুসলিম)

প্রথম হাদীসে খলীফাবিহীন অবস্থায় মুত্যুকে জাহেলিয়াতের যুগের মৃত্যু হিসেবে উলেখ করায় বোঝা যায় যে খিলাফত একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং দ্বিতীয় হাদীসে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী না আসায় কার তত্ত্বাবধানে মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হবে সেটা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে খিলাফত ব্যবস্থা ও খলীফার তত্ত্বাবধান। কাজেই একজন খলীফার উপস্থিতি ফরয।

সাহাবারা (রা.) এই বিষয়টির গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝতেন, তাই তাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলুলাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর তাঁরা তাঁর দাফন কার্যকে বিলম্বিত করে আগে খলীফা

নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর সময় পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার জন্য ছয়জনের প্যানেল গঠন করেছেন। এই ছয়জনের ভেতর উসমান (রা.), আলী বিন আবু তালিব (রা.) ও আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) ছিলেন। এই ছয়জন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের (রা.) ছয়জন– যাঁরা পৃথিবীতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। উমর (রা.) তখন আদেশ জারি করেছিলেন যে, তিন দিনের ভেতর খলিফা বাছাই'র ক্ষেত্রে যদি মতৈক্যে পৌঁছানো না যায় তবে যে মতভেদ করতে থাকবে তার শিরচ্ছেদ করতে হবে। যদিও যথাযথ কারণ ছাড়া যে কোন হত্যাকান্ড হারাম, তবু উমর (রা.)-এর এই আদেশের বিরোধিতা সাহাবারা (রা.) কেউ করেননি। এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় সাহাবারা (রা.) খলীফা এবং খিলাফত ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যমান থাকাটা কতটা গুরুত্বের সাথে বুঝেছিলেন। খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য (ইজ্‌মা আস্‌-সাহাবা) একটা সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রমাণ যে খালীফা নিয়োগ করা ফরয।

একইভাবে বিভিন্ন যুগের ইসলামী বিশেষজ্ঞগণও বিভিন্নভাবে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা'র কথা জোর দিয়ে উলেখ করেছেন।

ইমাম নববী (রহ.) বলেছেন, *"(ইসলামী বিশেষজ্ঞদের) এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একজন খলীফা নির্বাচন করা মুসলমাদের উপর ফরজ বিষয়।" (শরহে সহীহ মুসলিম)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, "এটা লক্ষ্যণীয় যে, জনগণের বিষয়াদি দেখাশুনা করার জন্য খিলাফত ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকা দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

ইমাম আল জুয়াইরি (চার মাযহাবেরই যিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ) বলেন, "ইমামরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইমামত (নেতৃত্ব ও কতৃত্ব) হচ্ছে একটি ফরয বিষয় এবং মুসলামানদেরকে অবশ্যই একজন ইমাম (ইসলামী শাসক) নিযুক্ত করতে হবে।" (ফিকহ আল মাযাহাব উল আরবাআ)

খলীফা নিয়োগ থেকে বিরত থাকা একটা বড় গুনাহ্‌, কারণ এটা ইসলামের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দায়িত্ব। শারী'আহ্‌ বাস্তবায়ন এবং দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে ইসলাম উপস্থিত থাকা না থাকা এই দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি মুসলমানরা তাদের ভেতর থেকে একজন খলীফা নির্বাচন থেকে বিরত থাকে তবে সামগ্রিকভাবে পুরো মুসলিম জাতি খুব বড় গুনাহ্‌'র কাজ করে। যদি তারা এই দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তের প্রতিটা মুসলমানের উপর এই দায়িত্ব পালন না করার পাপ আরোপিত হবে। যদি মুসলমানদের কোনও দল এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে এবং অন্যরা তা থেকে বিরত থাকে তবে যারা সচেষ্ট থাকে তারা ব্যতীত অন্যান্যদের উপর এই পাপ আরোপিত হবে। এটা এজন্য যে আলাহ্‌ তাদেরকে এমন একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন যা তারা পালন করেনি কিংবা পালনের চেষ্টাও করেনি। এভাবে তারা এই পৃথিবীর জীবনে ও পরকালে কঠিন শাস্তি ও লজ্জার ভাগী হবে। যারা এরকম করে তারা

একদিকে খিলাফত প্রতিষ্ঠা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং সেই সাথে পরোক্ষভাবে শরী'আহ্‌ নির্ধারিত সেইসব কাজ থেকেও বিরত থাকে যেগুলোর বাস্তবায়ন খিলাফত থাকার উপর নির্ভরশীল। আর এটা বলাবাহুল্য যে খিলাফতই পৃথিবীতে আলাহ্‌'র আইন প্রতিষ্ঠিত রাখে, আলাহ্‌'র বাণীকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে তুলে ধরে এবং ইসলামকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। সুতরাং এ ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য থেকে বিরত থাকা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৪. খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা এখন সবচেয়ে জরুরী বিষয়

ইসলাম কিছু কিছু বিষয়কে মুসলমানদের জন্য তাদের সবচেয়ে জরুরী বিষয় এবং কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো যা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে তারা যেন এজন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করে এমনকি প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দেয়। কাজেই নিজেদের জরুরী বিষয় নির্ধারনে মুসলমানদের কোন পছন্দের সুযোগ নেই বরং তা ইসলাম কতৃক সুনির্ধারিত। ইসলাম যেটাকে সবচেয়ে জরুরী বলেছে একজন মুসলমানকেও সে বিষয়টিকে ওভাবেই দেখতে হবে। একইভাবে, ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্জন কতটা বিপদসংকুল, কতটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, তা নিয়ে নিজের মতো করে ভাবার সুযোগও একজন মুসলিমের নেই। সুতরাং যখনই ইসলাম কোন একটি বিষয়কে মুসলমানদের সামনে তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, জীবন কুরবানী করে হলেও তাদেরকে ঐ বিষয়টি অর্জন করতেই হবে।

একজন মুসলিম যদি কুর'আন ও সুন্নাহকে ভালো করে অধ্যয়ণ করে তবে সে দেখতে পাবে যে, ইসলাম সুস্পষ্টভাবে এবং প্রকাশ্য বক্তব্যের মাধ্যমে এসব জরুরী বিষয়কে নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এসব বিষয় অর্জনে কতটা অত্যাবশ্যকীয় প্রচেষ্টা দরকার তা-ও নির্ধারণ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইসলাম নির্ধারিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলিম উম্মাহ'র ঐক্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অখন্ডতা। ইসলাম উম্মাহ এবং রাষ্ট্রের ঐক্যের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ঘোষণা দিয়ে উক্ত বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে জীবন-মরণ বিষয় হিসেবে দেখার নির্দেশ দেয়।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *"যখন তোমরা একজন ব্যক্তির অধীন তোমাদের বিষয়াদি পরিচালনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছ এবং ঐ সময় কোন ব্যক্তি যদি তোমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা কর।" (মুসলিম)*

এ হাদীস থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, মুসলিম উম্মাহ্‌'র ঐক্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অখন্ডতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই ঐক্যে ফাটল বা বিভাজনের জন্য যে বা যারা প্রয়াস চালাবে তাদের হত্যা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবেনা। এভাবে রাষ্ট্র ও উম্মাহ'র বিভাজন নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে এটা খুব সহজেই প্রতীয়মান হয় যে উম্মাহ এবং

রাষ্ট্রসমূহের ঐক্য সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারন আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর হুকুম করেছেন আর সেইসাথে এবিষয়ে জীবণ-মরণ সংগ্রামেরও আদেশ করেছেন।

একইভাবে, এমন অস্যংখ্য জরুরী বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাপারে ইসলাম মুসলমানদের আদেশ করে যাতে তারা তাদের জীবন দিয়ে হলেও সংগ্রাম ও ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পিছপা না হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলমান তার জীবনের বিনিময়ে হলেও রাসূলের (সাঃ) সম্মান রক্ষার্থে লড়ে যাবে। একইভাবে নিজেদের ভূমি যখন কাফেরদের দ্বারা দখলকৃত হয় তখন মুসলমানদের উপর আলাহ্'র আদেশ হলো আমৃত্যু লড়ে যাওয়া এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। অনুরূপভাবে, মুসলমানরা এই বিষয়ে আদেশ প্রাপ্ত যে সর্বদা দাওয়াহ এবং জিহাদের মাধ্যমে তারা আলাহ্'র বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে যাতে আলাহ্'র রাস্তায় শাহাদাৎ বরণ করে হলেও এই পৃথিবীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলমানদের সর্বদা জাগ্রত ও সচেষ্ট থাকতে হবে এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।

খিলাফত ইসলাম নির্ধারিত জরুরী বিষয়গুলোর মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারন, এটা সাধারণভাবে আমরা সবাই জানি যে আলাহ্ মুসলমানদের হুকুম দিয়েছেন তাদের জীবন আলাহ্'র আইন দ্বারা পরিচালিত করতে এবং বাতিল (কুফর) এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে এবং এই সংগ্রাম যাতে হয় জীবন-মরণ সংগ্রাম। মুসলমানরা কখনোই তাগুতী (খোদাদ্রোহী) আইন মেনে নিবেনা এবং এর সম্মুখে নিশ্চুপ থাকবেনা – এটাই হলো আলাহ্'র হুকুম। এমন অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস আছে যার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে মুসলমানরা সর্বদাই আলাহ্'র আইন দ্বারা নিজেদের চালিত করতে বাধ্য এবং শাসক ও শাসনযন্ত্র যদি আলাহ্র আইন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয় এবং কুফরী আইন প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করে তবে সেটা প্রতিহত করতেও তারা বাধ্য। এরকম তাগুতী সরকারকে রুখতে হবে জীবনের বিনিময়ে হলেও।

উবায়দাহ ইবনুস সামিত এর বরাত দিয়ে বুখারীতে বর্ণিত আছে : *একদা রাসূল (সাঃ) আমাদের সকলের কাছ থেকে শপথ নিলেন যাতে আমরা সুখে, দুঃখে তাঁর কথা শুনি এবং মানি, সহজ, কঠিন এবং খারাপ অবস্থাতেও যাতে তাঁর আনুগত্য করি। আমরা আরও শপথ করেছি যে আমরা কখনো শাসকদের সাথে বিতন্ডায় যাবনা যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের দ্বারা* ***সুস্পষ্ট কুফর*** *পরিলক্ষিত হচ্ছে। (বুখারী)*

অতএব, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এরই মাধ্যমে আলাহ্'র প্রণীত আইন বাস্তবায়ন এবং কুফরী শাসন ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের মূলোৎপাটন সম্ভব। কুফরের মূলোৎপাটন হলো গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় যা রাসূল (সাঃ) এর হাদীস থেকেই আমরা বুঝেছি যেখানে তিনি (সাঃ) বলেছেন, *"যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা সুস্পষ্ট কুফর দেখতে পাচ্ছ।"* অতএব, খিলাফতকে তার যথাযথ স্থানে

প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিকে জীবন-মরণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং এর জন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

সর্বোপরি, খিলাফত কেবল একটি জরুরী বিষয়ই নয় বরং ইসলাম কতৃক নির্ধারিত জরুরী বিষয়সমূহের মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা বাকী জরুরী বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন খিলাফত প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, আলাহ্ ও রাসূল (সাঃ) এর সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করা, ইসলামী ভূমিসমূহকে কাফেরদের হাত হতে দখলমুক্ত করা কিংবা আলাহ্'র বাণীকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করা – ইত্যাদি জরুরী বিষয়গুলোর জন্য একটি শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন যে শক্তিমত্তার সাথে শত্রুর সাথে লড়াই চালিয়ে যাবে এবং মুসলমানদের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে, শত্রুদের পরাজিত করবে এবং বিজয় ছিনিয়ে আনবে। এ নেতৃত্ব হচ্ছে খিলাফত।

আলাহ্'র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, *"ইমাম (খলীফা) হলো সেই ঢাল যার পেছনে দাড়িয়ে মুসলমানরা লড়বে এবং কাফেরদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করবে।" (মুসলিম)*

সাহাবাগণ (রা.) এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং খিলাফত বিদ্যমান থাকা যে দ্বীনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে বিষয়ে ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর সময় পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার জন্য ছয়জনের প্যানেল গঠন করেন। এই ছয়জনের ভেতর উসমান (রা.), আলী বিন আবু তালিব (রা.), ও আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) ছিলেন। এই ছয়জন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের (রা.) ছয়জন – যাঁরা পৃথিবীতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। উমর (রা.) তখন আদেশ জারি করেছিলেন যে, তিন দিনের ভেতর খলীফা বাছাই এর ক্ষেত্রে যদি মতৈক্যে পৌঁছানো না যায় তবে যে মতভেদ করতে থাকবে তার শিরচ্ছেদ করতে হবে। যদিও যথাযথ কারণ ছাড়া যে কোনও হত্যাকান্ড হারাম তবু উমরের (রা.) এই আদেশের বিরোধিতা সাহাবারা (রা.) কেউ করেননি। খলীফা নিয়োগের ব্যাপারে সাহাবাদের ঐক্যমত (ইজ্মা আস্-সাহাবা) এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের (রা.) হত্যা করার বিষয়ে তাদের ঐক্যমত এটাই প্রমাণ করে যে এটি দ্বীনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

রাসূল (সাঃ) নিজেও এই বিষয়কে জীবন-মরণ বিষয় হিসেবে দেখেছিলেন। আলাহ্ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে ইসলামের বাণী সহকারে পাঠানোর পর তিনি (সাঃ) তাঁর দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু করেছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম এর মাধ্যমে যার লক্ষ্য ছিল ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা। তিনি (সাঃ) এ কাজে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়া সত্বেও কেবলমাত্র ইসলামকে বিজয়ী রূপে দেখার জন্যই এই কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। মক্কার কুরাইয়শরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব এর কাছে যখন তাদের দাবি নিয়ে গেল যে যেকোন মূল্যে যেন আবু তালিব তাঁর ভাতিজাকে কুরাইশদের উপর চড়াও হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে তখন আবু তালিব রাসূল (সাঃ) কে

বলল, "তুমি আমাকে ও তোমাকে নিষ্কৃতি দাও, এমন বোঝা আমার উপর চাপিও না।" উত্তরে রাসুল (সাঃ) বললেন- *"আলাহ্'র কসম, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দিতে চাইতো যেন আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তবুও আমি তা পরিত্যাগ করতাম না যতক্ষণ না আলাহ এ কাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।"*

মুসলমানদের বর্তমান বাস্তবতা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়, এর জন্য কোন ব্যাখ্যা বিশেষণের প্রয়োজন নেই। বর্তমানে মুসলমানরা সবচেয়ে কঠোর অগ্নিপরীক্ষা আর কষ্টভোগের সম্মুখীন। তাদের ভূমিসমূহ কাফেরদের দ্বারা দখলকৃত, তারা আজ ৫০ টিরও বেশী দূর্বল আর অপ্রয়োজনীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত; তারা আজ এতই দূর্বল যে শত্রুর আক্রমণ এবং আগ্রাসন থেকে নিজেদের প্রতিহত করার কোন সামর্থ তাদের নেই। তাই বর্তমানে প্রতিটি মুসলিম দেশের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আলাহ্'র নাযিলকৃত আইনের বাস্তব প্রতিষ্ঠা এবং তৎপরবর্তীতে অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের সাথে একত্রিত হওয়া। বর্তমান সময়ে মুসলমানরা যে বাস্তবতার সম্মুখীন তার একমাত্র সমাধান হলো খিলাফত শাসন ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যার মাধ্যমে আলাহ্'র আইন প্রতিষ্ঠা এবং ফলশ্রুতিতে মুসলিম দেশসমূহের ঐক্যসাধনও সম্ভবপর হবে।

অধ্যায় ৪ – ইসলামে রাজনীতি একটি আবশ্যিক বিষয়

১. সমাজ পরিবর্তনের দায়িত্ব

সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করা অন্যতম ইসলামী দায়িত্ব। ইসলাম একজন মুসলিমকে কেবল কিছু ব্যক্তিগত ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে দেয়নি বরং সমাজের প্রতি তার দায়িত্বগুলোও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। তাই যখন সমাজে ইসলাম থাকে না এবং মানব রচিত শাসন ব্যবস্থার ফলাফল হিসেবে সমাজের সর্বত্র বৈষম্য, জুলুম, বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে তখন এই সমাজ পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ না করে একজন মুসলিমের চুপচাপ বসে থাকার অনুমতি নেই।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন তার হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। তার এই সামর্থ্যও না থাকলে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করে (ঘৃণার মাধ্যমে), আর এটা হলো দূর্বলতম ঈমান।" (মুসলিম, তিরমিযী)

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আরো বলেন:

"যারা আলাহ্'র হুকুম মেনে চলে আর যারা সেগুলোকে নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়ালে লঙ্ঘন করে, (উভয়ে) যেন তাদের মতো যারা একই জাহাজে আরোহণ করে। তাদের একাংশ জাহাজের উপরের তলায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে এবং অন্যরা এর নিচের তলায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। যখন নিচের লোকদের পিপাসা মেটানোর প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে জাহাজের উপরের অংশের লোকদের অতিক্রম করে যেতে হয়। (তাই) তারা (নিচতলার লোকেরা) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিল, 'আমরা যদি জাহাজের নিচের দিকে একটা ফুটো করে নিই তাহলে জাহাজের উপরের তলার লোকদের কোন সমস্যা করবো না।' এখন যদি উপরের তলার লোকেরা নিচতলার লোকদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে নিশ্চিতভাবেই তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর তারা যদি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে, (তবে) তারা (উপরতলা) রক্ষা পাবে এবং এভাবে (জাহাজের) সবাই রক্ষা পাবে।" (বুখারী)

তাই কেউ ব্যক্তিগত ইবাদত ঠিকমতো চালিয়ে গেলো আর সমাজে যেসব অব্যবস্থাপনা চলছে সে ব্যাপারে কিছু করলো না বা বলল না এটা কোন ইসলামী চিন্তা নয়। উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে এটা পরিষ্কার যে সমাজে যখন জুলুম, অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন ঐ সমাজে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য ঐ সমাজের পরিবর্তন করার জন্য কাজ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসলে সবাই একসাথে শাস্তিযোগ্য হবে।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"এক শহরের অধিবাসীদের উপর আলাহ্ তাআলা শাস্তি প্রদান করেন। তাদের মধ্যে আঠার হাজার লোক এমন ছিল যাদের আমল ছিল নবীদের আমলের সমতুল্য।" জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসূলালাহ (সাঃ)! কেন তবে তাদের উপর শাস্তি এসেছিল?' রাসূলুলাহ্ (আঃ) বললেন, "এই কারণে যে, (বাকীদের পাপকাজ করতে দেখেও) তারা আলাহ্'র উদ্দেশ্য বাকীদের উপর ক্রুদ্ধ হতো না এবং তাদেরকে (পাপকাজ থেকে) বারণ করতো না।"

কায়েস ইবনে আবি হাযমের বরাত দিয়ে আবু দাউদে বর্ণিত: আলাহর প্রশংসা এবং গুণগাণ গাওয়ার পর আবু বকর বললেন, "হে মানুষ! তোমরা এই আয়াতটি পড় কিন্তু এর মমার্থ বোঝ না, **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের অন্তরকে পাহারা দাও; তোমরা যদি সঠিক পথে নিজেদের পরিচালিত করতে পার, তাহলে যারা বিপথে গেছে তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবেনা।" [সূরা মায়েদা : ১০৫]** আমি রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি : *"যারা কোন অত্যাচার হতে দেখেও হাত গুটিয়ে রাখে আলাহ্ তাদের সকলকে শাস্তির সম্মুখীন করবেন,"* এবং আলাহ্'র রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন: *"যখন কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং কেউই তাদের প্রতিরোধ করেনা তখন আলাহ্ গোটা জাতির উপর শাস্তি নাযিল করেন যা তাদের সকলকে ছেয়ে ফেলে।"(আবু দাউদ/৩৭৭৫)*

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পবিত্র সীরাতের দিকে তাকালে দেখা যায় তিনি এমন একটি সমাজে এসেছিলেন যা ছিলো পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন, সব ধরণের অন্যায়, অত্যাচার, অনাচারে পরিপূর্ণ। ঐ সমাজের লোকেরা মিথ্যা ইলাহদের পূজা করতো, ওজনে কম দিতো, এতিম ও দাসদের অধিকার বঞ্চিত করতো, কথায় কথায় যুদ্ধ আর হানা-হানিতে মেতে উঠতো ইত্যাদি। এমনি এক পরিস্থিতিতে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে ঐ সমাজকে পরিবর্তনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সমাজের এসব অনাচারের বিরুদ্ধে কথা বলে সমাজকে ইসলামের দিকে জোরালোভাবে আহ্বান করেন। তিনি কেবল ব্যক্তিদেরকে সংশোধনে ব্যস্ত থাকেননি বরং পুরো সমাজদেহটাকেই সুস্থ করার লক্ষ্যে সমাজের সব প্রচলিত মিথ্যা ধ্যান ধারণা ও আনাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। অতএব, তাঁর অনুসরনে আমাদেরকেও বর্তমান ধ্বংসন্মুখ সমাজকে পরিবর্তন করার কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. রাজনীতি হচ্ছে ইসলামের একটি আবশ্যিক বিষয়

আরবীতে রাজনীতি ব্যাপারটিকে বলা হয় 'সিয়াসত' যার অর্থ হচ্ছে উম্মাহ'র দেখা-শোনা করা। ইসলামে রাজনীতি বলতে বোঝায় জনগণের সামগ্রিক কল্যান ও অধিকার সমুহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড। উপরন্তু ইসলামে রাজনীতি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বর্তমান অনৈসলামী শাসন ব্যবস্থাকে অপসারণ করে তদস্থলে

ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং জনগণের উপর পরিপূর্ণরূপে ইসলাম বাস্তবায়ন করা হবে। অতএব, রাজনীতি হচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

যখন থেকেই খিলাফত ধ্বংস হলো এবং কুফরী রাজনৈতিক ব্যবস্থা মুসলিম দেশসমূহে প্রয়োগ শুরু হলো, তখন থেকেই ইসলাম রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক ময়দান দখলকৃত হলো পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা যার ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী মতবাদ অর্থাৎ ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে ফেলা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণের এই মতবাদকে মেনে নিয়েছে এবং খুবই সক্রিয়তার সাথে এটিকে প্রচার করে চলেছে। তারা এই পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাকে মুসলিম জাতিসত্তার ভেতর প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর। মুসলমানদের তারা এই বলে বিপথে চালিত করতে চায় যে, ধর্মকে কখনোই রাজনীতির সাথে একত্রিত করা যাবে না। এসবের মূল উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো পশ্চিমা কুফর শক্তি যাতে নিশ্চিত থাকতে পারে যে মুসলমানরা সর্বদাই অত্যচার আর নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয় এবং কখনোই যাতে মনশ্চক্ষে ইসলামী পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখতে না পায়। পশ্চিমা কুফর শক্তি এও নিশ্চিত করতে চায় যে মুসলমানরা যাতে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নিজেদের আলাদা রাখে। এসবের কারণ হলো পশ্চিমারা ভালো করেই জানে যে একমাত্র রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং ইসলামভিত্তিক রাজনীতি ছাড়া পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তা ও শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার আর কোন উপায় নেই। এই প্রচারাভিযান আজ এ পর্যায় পর্যন্ত পৌছে গেছে যেখানে দেখানো হচ্ছে রাজনীতি হলো ইসলামের মহানত্ব ও পারলৌকিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী।

কিন্তু আলাহ্ এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যে আমরা যাতে রাজনীতির সাথে সংযুক্ত থাকি এবং শাসককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করি। স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত ভঙ্গিতেই আলাহ্ হুকুম দিয়েছেন যাতে আমরা সর্বদা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে অন্যদের বিরত রাখি। এ কাজের মধ্যে শাসকদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজে বিরত রাখাও শামিল। আর শাসকবর্গকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করা রাজনীতির প্রধান অংশ।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।"
[সূরা আলি ইমরানঃ ১১০]

এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীসও রয়েছে যাতে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার জন্য।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দেবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং লোকদের কল্যাণময় কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করব। অন্যথায় আলাহ্ কোন আযাবের মাধ্যমে তোমাদের ধ্বংস কওে দেবেন কিংবা তোমাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক পাপাচারী, অন্যায়কারী ও জালিম লোকদেরকে তোমাদের উপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দেবেন। এসময় তোমাদের মধ্যেকার নেককার লোকেরা মুক্তির জন্য আলাহ্'র কাছে দোয়া, প্রার্থনা ও কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তা কিছুতেই আলাহ্'র দরবারে কবুল হবে না।" (মুসনাদে আহমাদ)

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আরো বলেন,

"নিশ্চয়ই আলাহ্ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পাপাচারের জন্য জনসাধারণকে শাস্তি দেন না। কিন্তু যখন তারা (জনসাধারণ) তাদের সামনে মন্দকাজ হতে দেখে এবং তাদের ক্ষমতা থাকা সত্বেও তা নিবারন না করে তখন আলাহ্ ব্যক্তি বিশেষ ও জনসাধারণ উভয়কেই শাস্তি দেন।" (শরহে সুন্নত)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আলাহ্ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। উক্ত হাদীস সমূহ মুসলিমদের বাধ্য করে সর্বদা শাসকদের সৎ কাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করতে কারণ হাদীসের নির্দেশটি সার্বজনীন বিধায় অন্য সকলের পাশাপাশি শাসকদের জন্যও প্রযোজ্য। তবে শাসকদেরকে ন্যায় ও সৎকাজের প্রতি আদেশ এবং অন্যায় হতে বাধাদানের গুরুত্বকে সামনে রেখে শুধুমাত্র শাসকদের জবাবদিহিতার বিষয়ে আলাদা সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে। রাসূলূলাহ (সাঃ) বলেছেন,

"তিন বিষয়ে মুসলমানের অন্তর কৃপণতা প্রদর্শন করতে পারে না। এক, স্বীয় কাজ-কর্ম আলাহ্'র উদ্দেশ্যে পরম নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে; দুই, দেশের শাসকবর্গের প্রতি সদুপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তিন, মুসলমানদের জামাত আকঁড়ে ধরার ক্ষেত্রে।" (আহলে সুনান)

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি : *"মানুষ কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও তার দুই হাত চেপে ধরে তাকে প্রতিহত না করলে অচিরেই আলাহ্ তা'আলা তাদের সকলকে (অর্থাৎ অত্যাচারী ও যারা অত্যাচার মেনে নেয় উভয়কে) তাঁর ব্যাপক আযাবে নিক্ষেপ করবেন।" (তিরমিযী)*

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

"যদি তুমি দেখ যে আমার উম্মত কোন জালেমকে একথা বলতে ভয় পাচ্ছে যে, 'তুমি একজন জালেম' তাহলে আমার উম্মতকে বিদায়" [অর্থাৎ এটা উম্মতের জন্য বিদায় বা পতনের সংকেত] (আহমাদ, তাবারানী, হাকিম, রায়হাকী)

এবং

"অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।" (তিরমিযী)

এসব হাদীস শাসকদের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ এবং তাদের কঠোরভাবে জবাবদিহি করার জন্য মুসলিম জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট অর্থবোধক হাদীস।

অতএব, কঠোর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেসব শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া বাধ্যতামূলক যারা জনগণের অধিকার হরণ করে অথবা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অথবা উম্মাহ'র যে কোন বিষয়াদি উপেক্ষা করে অথবা এই জাতীয় কোন পদক্ষেপ নেয়; কেননা এটা হলো এটা আলাহ্'র আদেশ, এমনকি এটাকে আলাহ্ জিহাদের সমতুল্য গণ্য করেছেন। আলাহ্'র রাসূল (সাঃ) স্বয়ং নিজেও উপরোক্ত হাদীসে এটাকে সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং শাসককে প্রশ্নের মুখোমুখি করা মুসলমানদের জন্য যে বাধ্যতামূলক এটা প্রমাণ করার জন্য এই বক্তব্যই যথেষ্ট। শাসকের অত্যাচার ও যুলুম-নির্যাতনকে পরোয়া না করে মুসলমানদের তার মুখোমুখি হওয়াকে আলাহ্'র রাসূল (সাঃ) স্বয়ং নিজেই নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন যাতে একজন মুসলমান সর্বদাই এরূপ কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত থাকে:

"শহীদদের সর্দার হামযা এবং ঐ ব্যক্তিও, সে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাড়িয়ে উপদেশ দেওয়ার পর (ঐ শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলে।" (হাকিম)

এটা অন্যতম জোরালো এক বক্তব্য যা থেকে বুঝা যায় যে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সর্বদাই কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রকাশ্যে তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করতে হবে।

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং এ কাজের পরিধি অনেক ব্যাপক এবং শাসকবর্গ বিশেষভাবে এর অন্তর্ভূক্ত। আর শাসকবর্গকে আদেশ-উপদেশ দেয়া আর তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করা রাজনীতির প্রধান অংশ। কাজেই ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতি করা উম্মাহ'র উপর একটি জরুরী দায়িত্ব।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পবিত্র সীরাতের দিকে তাকালে আমরা দেখব তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। প্রথমত: তিনি সমাজে ইসলামের বার্তা প্রচার করেছেন এবং কুফর সব ধ্যান-ধারণা ও জাহেলিয়াতের সমস্ত নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য এবং এ সবের নিন্দা-বিরোধীতা চালিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত: তিনি মক্কার শাসকগোষ্ঠী ও নেতৃবৃন্দকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন এবং নিজেদের মনগড়া ব্যবস্থা ত্যাগ করে ইসলামের নেতৃত্ব মেনে নিতে বলেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে এতটাই দৃঢ় ছিলেন যে, কাফেরদের বিরোধীতার উত্তরে তিনি তাঁর চাচা আবু-তালিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, *"আলাহ্র কসম, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দিতে চাইতো যেন আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তবুও আমি তা পরিত্যাগ করতাম না যতক্ষণ না আলাহ্ এ কাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা*

আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।" তৃতীয়ত: তিনি বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এবং এ ব্যাপারে বিরুদ্ধশক্তির মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছেন যা সুস্পষ্টরূপেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান ছিল। চতুর্থত: তিনি মদীনাবাসীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাড়া পেয়ে সেখানে হিজরত করেছেন এবং সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমরা সব বিষয়ে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে অনুসরণ করতে আদিষ্ট। সীরাতের এসব ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে বর্তমান কুফর সমাজে ইসলামী রাষ্ট্রের মাধ্যমে ইসলামকে আবার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর অনুসরণে রাজনীতি করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। আসলে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সর্বযুগে সর্ব পরিস্থিতিতে একটি ওয়াজিব বিষয় এবং ব্যাপক অর্থে এটাই ইসলামী রাজনীতি। তাই ইসলামের আর সব অবশ্য পালনীয় বিষয়ের মতো এ বিষয়টিকেও আমাদের পালন করতে হবে এবং সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনীতিতে যোগ দিতে হবে।

৩. ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকা বাধ্যতামূলক

ইসলাম দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন চালানো ফরয একথা বোঝার পর একজন মুসলমানের পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা ছাড়া উপায়ন্তর নেই। কিন্তু কারো একক প্রচেষ্টায় বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা অপসারণ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, বরং একাধিক লোকের একটি দল মিলেই একাজ করতে হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় রাসূলূলাহ (সাঃ) দেখানো পদ্ধতিতে একটি দল গঠন করা বা অনুরূপ একটি আন্দোলনরত দলের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা একজন মুসলমানের জন্য একটি আবশ্যিক বিষয়।

আলাহ্ তা'আলা বলেন,

"তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যানের প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম"
[সূরা আলি ইমরান : ১০৪]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদের মাঝে অবশ্যই এমন একটি সুসংগঠিত দল থাকে, যে দল নিম্মোক্ত দুটি কাজ সম্পাদন করবে:

1. খায়ের তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান করা।
2. আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) করা।

এই দলটি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক দল যে, আলোচ্য আয়াতটি মুসলমানদের নিকট এমন একটি দল গঠন করার দাবী করেছে, যে দলের কাজ হবে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা এবং আমর বিল মা'রূফ আর নাহি আনিল মুনকার করা। একাজের মধ্যে শাসকদেরকে ভাল কাজ করতে বলা এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখাও শামিল। বরং, শাসকদেরকে কাজ কর্মের ব্যাপারে ভাল-মন্দের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা এবং তাদেরকে উপদেশ দেয়াই সবচেয়ে বড় আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকার। আর এটিই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ। বস্তুতঃ একাজটি হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দলের মূল কাজ সমুহের একটি। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক ধাঁচের দল গঠন করা ফরয। তাছাড়া রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি ছাড়া একটি শাসনব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে আরেকটি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কাজেই একজন মুসলমানের জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা বা কোন দলটি সঠিক অর্থাৎ ইসলামী চিন্তা ও পদ্ধতির উপর কাজ করছে, সেটা খুঁজে বের করে উক্ত দলের সাথে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়ানো একটি আবশ্যিক বিষয়।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতি আমাদের দেখিয়ে গেছেন তাতে প্রথম ধাপ ছিলো একটি দল গঠন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না বরং ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। যদি কারো সাহায্য ছাড়া একাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো তবে তাঁর পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। তথাপি তিনি সাহাবাদের (রা.) একটি দলের মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। এ থেকেই একটি দল গঠন ও দলের সাথে কাজ করার আবশ্যকতা বোঝা যায়।

আসলে এটা সাধারণ বুদ্ধিরই দাবী যে, একা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আবার ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ না করে বসে থাকাও ইসলাম অনুমোদন করেনি। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক ইসলামী দল বা আন্দোলন খুঁজে বের করে অবিলম্বে তাতে যোগদান করতে হবে।

৪. সঠিক ইসলামী দল বা আন্দোলন এর ধরণ

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এবং এ লক্ষ্যে একটি দলে যোগদানের আবশ্যকতা বোঝার পর আমাদেরকে সঠিক ইসলামী আন্দোলনের ধরণ ও প্রকৃতি বুঝতে হবে। তাহলে আমরা শত দলের মাঝেও সঠিক ইসলামী আন্দোলনকে চিহ্নিত করতে পারবো।

প্রথমত: ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা দলটির একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে। দলের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা ইসলামের ভিত্তিতে হবে। দলের মূলনীতি বা শাখা-প্রশাখা কোন ক্ষেত্রেই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে গৃহীত কোন চিন্তা থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ দলটি অবশ্যই হতে হবে একটি রাজনৈতিক দল কেননা আন্দোলন ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। যেহেতু আন্দোলন হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অতএব, স্বাভাবিকভাবেই দলটি হবে একটি রাজনৈতিক দল। দলটির আহ্বান হবে সামগ্রিক ইসলামের দিকে, স্রেফ ইসলামের সুনির্দিষ্ট দু'একটি বিষয়ের দিকে নয়। এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন সর্বত্র দলটিকে এই আহ্বান ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এটাই করেছেন। অতএব, যে দল রাজনৈতিক দল নয় এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বর্জন করে অথবা কেবল সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ইসলামী ইবাদতের দিকে ডাকে, সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দিকে ডাকে না- সেটি সঠিক ইসলামী দল হবে না। অনুরূপে কেবল সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে নিয়োজিত দল বা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামের চর্চাকারী ও প্রচারকারী দল ইত্যাদি সঠিক ইসলামী দল হবে না কেননা তারা রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পথকে পরিহার করেছে।

তৃতীয়তঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দলটির সকল কার্যক্রম ও আন্দোলনের পদ্ধতি হতে হবে শুধুমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে এবং রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর দেখানো পথে । রাসূলুলাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে একটি অনৈসলামী সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন। দলটিকে পুরোপুরি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যুগের দোহাই বা কৌশলের অজুহাতে এমন কোন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া চলবেনা যা ইসলাম অনুমোদন করে না। যেমন: দলটি কোন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার অধীনে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না, যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইসলাম অনুমোদন করে না। অনুরূপে দলটির জঙ্গী কার্যক্রমের আশ্রয় নেয়াও চলবে না যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে অস্ত্র ব্যবহারের কোন পদক্ষেপ রাসূলুলাহ্ (সাঃ) নেননি। তিনি যেসব যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সবই ছিলো মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর। কাজেই কোন দল উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিলে সেটা সঠিক ইসলামী আন্দোলন হবে না।

চতুর্থতঃ আন্দোলনের পথে দলটি হতে হবে আপোষহীন। কোন ভয় বা প্রলোভনে আন্দোলনের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতির কোন দৃষ্টান্ত তাদের থাকতে পারবেনা। কেননা রাসূলুলাহ্ (সাঃ) তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) উপর শত জুলুম -নির্যাতন সত্ত্বেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে তিনি কখনো কোন আপোষ করেননি। বরং আপোষরফার প্রস্তাব পেয়ে তিনি বলেছিলেন, *"তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দিতো যাতে আমি এই কাজ পরিত্যাগ করি তবু আমি তা পরিত্যাগ করতাম না যতক্ষণ না আলাহ্ একাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা আমি একাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।"* তিনি (সাঃ) আরো বলেন, *"জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।"* অতএব দলটি শাসকগোষ্ঠীর শত জুলুমের সামনেও মাথা নত করবেনা এবং আপোষহীন ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সঠিক পথে তার আন্দোলন চালিয়ে যাবে। অনুরূপভাব, কোন লোভে পড়ে বা সংসদে দু'একটি আসনের লোভেও সে আন্দোলনের পথ থেকে সরে

আসবেনা। ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হওয়ার আগ মূহুর্ত পর্যন্ত এই আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে সেই দলের সত্যতার চিহ্ন।

পঞ্চমতঃ দলটি ইসলামের সত্যিকার শত্রু অর্থাৎ ইহুদী-খ্রীষ্টান-মুশরিক রাষ্ট্রগুলো এবং তাদের ইসলাম বিদ্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতিকে চিহ্নিত করবে। মুসলিম ভূমিগুলোতে তাদের সকল চক্রান্তকে উন্মোচন করে দিবে এবং এসবের বিরুদ্ধে উম্মাহ'কে সচেতন করার পাশাপাশি নিজেরা এসবের বিরুদ্ধে কঠোর রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। কেননা, এরাই ইসলামকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার পথে প্রধান শত্রু এবং মুসলিম দেশে বসিয়ে রাখা জালিম শাসকরা এদেরই এজেন্ট। অতএব, একটি সঠিক আন্দোলন আমেরিকা-বৃটেন-ইসরাইল-ভারত ও অনুরূপ কাফের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে কখনই মুসলমানদের বন্ধু মনে করবে না বরং শত্রু মনে করবে। তাই যে দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে অথবা মুসলিম ভূমিতে তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকবে তা সঠিক ইসলামী দল হতে পারে না।

ষষ্ঠতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব রূপরেখা সম্পর্কে দলটির সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে যাতে করে আলাহ্ প্রদত্ত বিজয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করা মাত্র তারা অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা সবকিছু ইসলামের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে ও পরিচালনা করতে পারে। কেবল ইসলামী আবেগ নির্ভর কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব রূপরেখা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাবিহীন কোন দল সঠিক ইসলামী দল হতে পারে না।

যে কেউ উপরোক্ত মাপকাঠির ভিত্তিতে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে যাচাই করবে তার পক্ষে সঠিক ইসলামী আন্দোলন ও সেই আন্দোলন পরিচালনাকারী দলকে চিহ্নিত করা কঠিন হবে না।

অধ্যায় ৫ – খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

১. সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতি

সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হলে সমাজ পরিবর্তনের ইসলামিক পদ্ধতি সম্পর্কেও সামগ্রিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হবে যাতে আমরা কাঙ্খিত পরিবর্তনের ধারায় সমাজকে পরিচালিত করতে পারি। মুসলিম উম্মাহ'র অধঃপতনের এই দীর্ঘ সময়কালে অনেক সৎ সংস্কারক ও অনেক সাহসী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা আন্তরিকভাবেই উম্মাহ'র এই খারাপ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন বা করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়েছেন – অর্থাৎ তারা মনে করেছেন সমাজ হলো কেবল অনেকগুলো ব্যক্তির সমষ্টি। তাই তারা চেষ্টা করেছেন ব্যক্তিকে ভাল মুসলমানে পরিণত করতে; তাকে ভাল আদব কায়দা, ধর্মীয় রীতি-নীতি শেখাতে এবং চিন্তা করেছেন যে ব্যক্তিগুলো যখন ভাল হয়ে যাবে তখন সমাজ ঠিক হয়ে যাবে। যদিও তাদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে অনেক মানুষ সে সব আন্দোলন ও কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো সমাজের বাস্তব অবস্থা অর্থাৎ সমাজে বিদ্যমান অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নিরাপত্তাহীনতা, বিশৃংখলা, নৈরাজ্য ইত্যাদির তো কোনও পরিবর্তন হয়ইনি বরং এগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বস্তুতঃ সমাজ বলা হয় মানুষের এমন সমষ্টিকে যা একই চিন্তা, একই অনুভূতি এবং একই ব্যবস্থার বন্ধনে আবদ্ধ। শুধু কতিপয় মানুষ একত্রিত হওয়াকেই সমাজ বলেনা। অনেক মানুষ কোথাও একত্রিত হলে তাকে একটি দল বা সমাবেশ বলা যেতে পারে, সমাজ নয়। যে সব উপাদান একটি সমাজকে সংগঠিত করে, সে গুলো হচ্ছে কতিপয় সম্পর্ক তথা রীতি নীতি। অন্য কথায় বলা যায় সমাজ হচ্ছে ব্যক্তি, চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি এবং নিয়ম পদ্ধতিগুলোর সমষ্টির নাম। তাই কোন সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে হলে সে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চিন্তা, অনুভূতি এবং সেখানে প্রচলিত নিয়ম-নীতি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদির শুদ্ধতা সাধনের মাধ্যমেই কেবল তা করা সম্ভব।

যখন মানুষ কোথাও দলবদ্ধ হয়ে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এমন কিছু ধারণা, বিশ্বাস ও আবেগ- অনুভূতি যা তাদের সবার মধ্যে বিদ্যমান। সেই সাথে তারা নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতিতে তাদের চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণে একটা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করে যা তাদের সাধারণ বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তারপর তারা একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে যা বাস্তবে এসব নিয়ম-পদ্ধতি প্রয়োগ ও রক্ষা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। এই কতৃপক্ষটিই হলো রাষ্ট্র বা সরকার। অতএব সমাজ নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ঃ

১. ব্যক্তি;

২. ব্যক্তিবর্গের (জনসাধারণের) মধ্যে প্রচলিত বা লালিত সাধারণ (Common) ধ্যানধারনা বা বিশ্বাস;

৩. জনগণের সাধারণ (Common) বিশ্বাস প্রসূত আবেগ-অনুভূতি;

৪. তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ম পদ্ধতি এবং তা বাস্তবায়ন ও রক্ষা করার জন্য যথাযথ কতৃপক্ষ (রাষ্ট্র/সরকার/সামাজিক নেতৃত্ব ইত্যাদি)।

সমাজের বর্তমান দুরবস্থার আমরা যদি প্রকৃত পরিবর্তন আনতে চাই তাহলে সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং সেগুলো পরিবর্তনের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পবিত্র সীরাতের দিকে তাকালে দেখা যায় তিনি (সাঃ) যে সমাজে এসেছেন তা পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছেন এবং এজন্য সমাজের সবগুলো উপাদানের দিকেই তিনি (সাঃ) মনোযোগ দিয়েছিলেন। একদিকে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাজে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া এবং তাঁর দাওয়াত গ্রাহণকারীদের ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গঠনের কাজ করছেন, অন্যদিকে একই সাথে তিনি ঐ সমাজে প্রচলিত সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত করেছেন, এসবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালিয়েছেন এবং কঠোর বক্তব্যের মাধ্যমে ঐ সমাজের নেতৃত্বশীলদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের বিরুদ্ধকারীরদের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের জন্য মক্কা ও এর পাশেপাশের বিভিন্ন শক্তিশালী গোত্রের নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও তাদের সাহায্য লাভের কাজ চালিয়েছিলেন।

বর্তমান যুগে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পদ্ধতি অনুসরণে আমাদের এই অনৈসলামী, জাহেল সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে আমাদের করণীয় হচ্ছে – প্রথমত, রাসূলুলাহ (সাঃ) এর অনুসরণে প্রথমে কিছু ব্যক্তিকে আহ্বান করে একটি দল গঠন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; দ্বিতীয়ত, এ দলটিকে নিয়ে বর্তমান সমাজে জীবন সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও মতবাদগুলোকে পরিবর্তন করার জন্য কাজ করতে হবে যার প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রকাশ্যে এসবের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং এসবের বিপক্ষে জনমত তৈরী করা। একই সাথে দলটি সমাজের মানুষকে ক্রমাগত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করতে থাকবে এবং সকল বিরুদ্ধ শক্তি বিশেষতঃ শাসকগোষ্ঠীর সব জুলুম ও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবে অর্থাৎ ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিতে মানুষকে সংগঠিত করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ডাক দিবে। তৃতীয়ত, যখন জনগণ আস্থার সাথে বুঝতে পারবে যে একমাত্র ইসলামী জীবনাদর্শ দ্বারাই তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এমন ব্যাপক জনমতকে ভিত্তি করে, সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় মানুষদের সহযোগীতায় বর্তমান নেতৃত্ব বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে সেখানে ইসলামী খিলাফত সরকার প্রতিষ্ঠা করবে যার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সমাজে ইসলাম বাস্তবায়িত হবে।

২. খিলাফত প্রতিষ্ঠায় রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পদ্ধতি

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই রাসূল (সাঃ) কে পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে; কারণ এ কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁকে (সাঃ) অনুসরণের আদেশ নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি আরো অন্যান্য কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণের আদেশের মতই। রাসূল (সাঃ) মদীনায় প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)'র কাছ থেকে সরাসরি দিক নির্দেশনা পেয়েছিলেন তাই তাঁর পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফত) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ্'র দেয়া পদ্ধতি । আল-কুর'আনে ইরশাদ হচ্ছে,

"বলঃ এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ্'র দিকে স্বজ্ঞানে মানুষকে আহ্বান করি এবং আমার অনুসারীরাও।" [সূরা ইউসুফঃ ১০৮]

আমরা যদি ওহী নাযিলের সূচনা থেকে মদীনায় ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) এর সীরাতকে মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করি তাহলে দেখব যে রাসূল (সাঃ) জাহেল সমাজকে পরিবর্তন করে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে কতগুলো সুস্পষ্ট পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন।

দল গঠনের পর্যায়

প্রথমে রাসূল (সাঃ) তাঁর (সাঃ) আহ্বান পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও তাঁর (সাঃ) সারা জীবনের সাথী আবু বকর (রা.) এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিবি খাদিজা (রা.) ও আবু বকর (রা.) এর সহযোগীতায় মক্কার মানুষের কাছে তিনি এই আহ্বান পৌঁছে দিতে শুরু করেন। তিনি (সাঃ) তাদের কাছেই প্রথমে যান যাদেরকে তিনি আগে থেকে চিনতেন এবং যাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আশাবাদী। এভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত মক্কা নগরীতে তাঁর (সাঃ) দাওয়াত সুপরিচিত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে (যা ছিল তিন বছর স্থায়ী) ব্যক্তিগত ভাবে মক্কার অধিবাসীদের কাছে ইসলাম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই সময় মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় ও তাদের জীবন পদ্ধতির সাথে সরাসরি কোনও দ্বন্দ্ব হয়নি।

এ পর্যায়ে কুর'আনের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের অনুসারীদের স্বভাব, অনুভূতি ও আচরণ গঠন করার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের এমন একটা দল তৈরীতে মনোযোগী হয়েছিলেন যাঁরা সমাজের সাথে ভবিষ্যৎ প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের যে কোনও পরিণতি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) সে সমাজ থেকে উঠে আসা তাঁর (সাঃ) অনুসারীদেরকে ইসলামের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-মূল্যবোধ ইত্যাদি অত্যন্ত গভীর ভাবে বুঝিয়ে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র উপর তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করলেন। রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেননি। রাসূল (সাঃ) সাহাবী আরকাম (রা.) এর গৃহে তাদেরকে একত্রিত করে কুর'আনের দেয়া ছাঁচে তাদের চরিত্রকে গঠন করতেন। রাসূল (সাঃ) এর সাহাবা (রা.) রা আরকাম (রা.) এর গৃহে একত্রিত হতেন, ইসলাম সর্ম্পকে শিখতেন, একসাথে

ইবাদত করতেন, ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য নিজেদের মনমানসিকতা প্রস্তুত করতেন এবং এসব কিছুই করতেন একটা দল হিসাবে।

প্রকাশ্য ও ব্যাপক দাওয়াতের পর্যায়

নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার মাধ্যমে দল গঠনের পর্যায় থেকে ব্যাপক ও প্রকাশ্য গণসংযোগের পর্যায়ে যাওয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়।

"অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" [সূরা আল-হিজরঃ ৯৪-৯৬]

দাওয়াতের এই পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান জাহেল সমাজ ব্যবস্থার প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করলেন। তিনি (সাঃ) ইসলামকে জনগণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিলেন। উদাহরণস্বরূপ যখন হযরত হামজা ও ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের দুটি সারি তৈরী করে একটাকে হযরত হামযা (রা.) ও অন্যটাকে হযরত ওমর (রা.) এর নেতৃত্বে প্রকাশ্যে কা'বার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করালেন। এ ঘটনা কুরাইশদেরকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকে মুসলমানরা প্রকাশ্যে কা'বা প্রাঙ্গনে ইবাদত করা শুরু করেন। এই পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) মুসলমানদেরকে একটা সুসংগঠিত দল হিসাবে উপস্থাপন করলেন যারা প্রচলিত মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আচার-অনুশীলন, আবেগ-অনুভূতি, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ সমস্ত সমাজ কাঠামোকে বদলে দেওয়ার ব্যাপারে ছিলেন পুরোপুরি যোগ্যতাসম্পন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সমাজকে পরিবর্তনের জন্য তাঁরা আপোসহীনভাবে জাহেল সমাজের মুখোমুখি হলেন। তাঁরা আলাহ্ যে সত্য নাযিল করেছেন তা দ্বারা মিথ্যাকে দূরীভূত করার বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করলেন। দাওয়াতের এই পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) জাহেল সমাজের অভিজাততন্ত্র ও ধন সম্পদ কেন্দ্রিক মূল্যবোধগুলোকে আঘাত করলেন, সমাজের অভাবী ও বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি কুরাইশ নেতাদের দ্বিমুখী নীতি ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যেরও মোকাবেলা করলেন, তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক চর্চাকে নিন্দা করলেন।

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ন্ত্রণকারী কুরাইশ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করলেন:

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদয় এবং সে নিজেও। কোন কাজে আসেনি তার ধন সম্পদ যা সে উপার্জন করেছে। সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও; যে ইন্ধন বহন করে, গলায় খেজুরের রশি নিয়ে।" [সূরা লাহাব : ১-৫]

ব্যাপক জনসংযোগের পর্যায়ে ইসলামিক মতাদর্শের ধারক দলকে অবশ্যই অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা নিতে হবে যেমনভাবে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (রা.) করেছিলেন। একটা সৎ ইসলামিক আন্দোলনকে অবশ্যই আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইত্যাদিসহ আরো যা কুফর-জাহেল মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা আছে সেগুলোর ভ্রান্তি, দূর্নীতি ও জুলুমের প্রমাণ জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে এবং তার

বিপরীতে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বাণীকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। একই সাথে শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণা, নৃশংসতা, ষড়যন্ত্র এবং জনবিরোধী নীতিসমূহ জাতিকে জানাতে হবে এবং সব জুলুম ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। যারা কোনও সমালোচনা, ভয় বা সংকোচের বশবর্তী হয়ে বা অন্য কোনও কারণে এই গুরুদায়িত্ব পালন থেকে বিরত হবে তারা রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে।

রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অপসারণ করার পর্ব

শোকের বৎসরের পর রাসূল (সাঃ) মক্কার বাইরের বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। যখনই কোনও সুযোগ আসত, তিনি (সাঃ) তাদেরকে তাঁর (সাঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহ্বান করতেন এবং তাঁকে (সাঃ) নিরাপত্তা দান করার অঙ্গীকার করার আহ্বান জানাতেন। রাসূল (সাঃ) ছাকিফ, কিন্দা, বনু আমির বিন সা'সা, বনু কালব এবং বনু হানিফসহ অনেক গোত্রের কাছেই নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। এরই এক পর্যায়ে আল-আকাবাতে মদীনার খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তারা তাঁর (সাঃ) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরের বৎসর হজ্জের মৌসুমে আল-আকাবাতে ১২ জন আনসার (সাহায্যকারী) রাসূল (সাঃ) এর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। এরপর তাঁরা (রা.) রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী মুসআব বিন উমায়ের (রা.) সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রাসূল (সাঃ) মুসআব বিন উমায়ের (রা.) কে মদীনার লোকদের ইসলাম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মদীনায় ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের বানী পৌঁছে গেল। পরের বছর মুসআব (রা.) এবং ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা রাসূলের (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁকে (সাঃ) আনুগত্য ও সমর্থন দানের অঙ্গীকার করার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তারা রাসূল (সাঃ) এর হাতে এই বলে শপথ করলেন যে, তারা সর্বাবস্থায় আলাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করবেন এবং নিজেদের জান-মাল ও সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দ্বারা রাসূল (সাঃ) কে শত্রুর আক্রমণের মুখে রক্ষা করবেন। আল-আকাবার দ্বিতীয় শপথের (যা বা'য়াত আল হরব বা যুদ্ধের শপথ নামে পরিচিত) পর রাসূল (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। কিছুদিন পরই আলাহ্'র অনুমতি লাভের পর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর (রা.) সহ মদীনায় হিজরত করলেন এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র।

৩. জনমত পরিবর্তন এবং গণআন্দোলন সৃষ্টির গুরুত্ব

সমাজ পরিবর্তন করতে হলে সমাজের প্রত্যেককেই পরিবর্তন করতে হবে এমন কোনও আবশ্যকতা নেই। যা আবশ্যক তা হল সম্মিলিত মতামত বা জনমতের পরিবর্তন সাধন। কোন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা শাসক টিকে থাকে ঐ ব্যবস্থা বা শাসকের প্রতি জনগণের

সক্রিয় বা নীরব সমর্থনের মাধ্যমে। যদি এই সমর্থনকে বিদ্বেষে পরিনত করা যায় এবং অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় তাহলে ঐ ব্যবস্থা বা শাসকের ভিত্তি নড়ে যায় এবং এর পতন ঘটানো সম্ভব হয়। এ ব্যাপারটিই হলো জনমত পরিবর্তন আর একটি সমাজকে ভেঙ্গে আরেকটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে জনমতের এই পরিবর্তন ঘটানো অপরিহার্য একটি বিষয়।

যেহেতু জনমত একটি সমাজে শাসন কতৃত্বের ভিত্তি কাজেই বর্তমান সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিবর্তন করতে হলে এ সমাজে ইসলামের ভিত্তিতে সব কিছু পরিচালনা করার ব্যাপারটিকে একটি জনমতে পরিণত করতে হবে; আর এর উপায় হচ্ছে সমাজের সর্বত্র সম্ভাব্য সব ধরণের উপায়ে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রের ত্রুটি ও অব্যবস্থাপনাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া এবং জনগণের প্রতি বিদ্যমান শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-বঞ্চনাকে তুলে ধরা। কীভাবে এ সকল শাসকরা জনগণের অর্থ-সম্পদ লুটপাট করছে, দিনের পর দিন জনগণকে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত করছে, তাদের সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী প্রভূদের পদলেহন করছে এবং দেশের সম্পদ ও নিরাপত্তা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে এসব কিছু পরিষ্কারভাবে উন্মোচন করে দিয়ে জনগণের সামনে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে হবে এবং জনগণকে সাথে নিয়ে সম্ভাব্য সকল রাজনৈতিক উপায়ে তাদের এসব কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ক্রমাগতভাবে এসব কর্মসূচীর মাধ্যমে এসব শাসকদের পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন এবং জনগণের ঘৃণার পাত্রে পরিণত করতে হবে।

এর পাশাপাশি সামাজিক অঙ্গন, রাজনৈতিক অঙ্গন সর্বত্র ইসলামী ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে জোরেশোরে উপস্থাপন করতে হবে। ধারাবাহিক ও ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমেই কেবল জনমত তৈরী করা যায়। যারা সমাজ পরিবর্তন করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সমাজের জনসাধারণের সাথে মিশতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় জনবিচ্ছিন্নতার কোনও স্থান নেই। একটা দীর্ঘ ও কষ্টকর বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সমাজকে অবশ্যই ইসলামী মতামতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মীরা সব ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের সাথী হবে, উম্মাহ্'র স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে এবং উম্মাহ'কে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য উৎসাহিত করবে। এভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দাবী জনমতে পরিণত হবে।

কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাকে একটি জনমতে পরিণত করাই লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র ধাপ নয়; কেননা কোন একটি বাস্তব কাজের দিকে এই জনমতকে পরিচালিত না করলে জনমত কোন কাজে আসবেনা আর রাষ্ট্রব্যবস্থা হাতে না থাকা অবস্থায় জনমতকে দীর্ঘ সময় একটা বিষয়ে এমনি এমনি ধরে রাখাও কঠিন কাজ। রাষ্ট্র তার প্রচার যন্ত্র ও নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনমতকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে জনমত তৈরী হওয়ার পর জরুরী হচ্ছে জনগণকে সংগঠিত করে একটি গণআন্দোলন তৈরী করা। এই গণআন্দোলন হচ্ছে একটি বাস্তব কর্মসূচী যার মাধ্যমে

জনমতকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত করা হবে এবং এই গণআন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থার পতন এবং তদস্থলে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। অতএব, গণআন্দোলন হচ্ছে জনমত বা গণজাগরণের ঠিক পরবর্তী ধাপ।

আমরা যদি রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর পদ্ধতির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে, তাঁর ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে এই ধাপগুলো ছিলো। তিনি মক্কায় ইসলামকে একটি জনমতে পরিণত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারনা চালিয়েছেন। মক্কায় যেখানেই জনসমাগম হতো সেখানেই রাসূলুলাহ্ (সাঃ) চলে যেতেন এবং ইসলামকে তুলে ধরতেন আর কাফেরদের বিশ্বাস ও রীতি-নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন। তিনি মক্কার তৎকালীন কাফের নেতৃত্বর স্বরূপ জনগণের সামনে উন্মোচন করে দিতেন। **"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক"** বা **"আপনি কি ঐ লোকটিকে দেখেছেন যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং এতীমদের তাড়িয়ে দেয়"**- কুর'আনের এসব আয়াতের মাধ্যমে তিনি আবু লাহাব, আবু জাহেল – এসব সমাজপতি বা শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছিলেন এবং এদের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এভাবে একসময় ইসলাম মক্কার সর্বত্র একটি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। অনুরূপে, তিনি মদীনা থেকে ইসলাম গ্রহণে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে মুসআব বিন উমায়ের (রাঃ) কে পাঠিয়ে ছিলেন, যিনি মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামকে পৌছে দিয়ে মদীনার সমাজে ইসলামকে একটি জনমতে পরিণত করেছিলেন এবং মদীনার বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থার পতন এবং তদস্থলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

আমাদেরকেও বর্তমান সমাজের পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠী বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করতে হবে এবং পরিশেষে এই জেগে উঠা জনগণকে পরিচালিত করতে হবে একটি গণআন্দোলনের দিকে যার মাধ্যমে আমরা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

৪. সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অপরিহার্যতা

ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই ঈমান ও কুফরের মধ্যে আপোষহীন দ্বন্দ ও সংগ্রাম চলে আসছে। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা যেন কখনই কাফের শক্তিকে নিজেদের বন্ধু বা মিত্র হিসাবে না নেয়। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা; তারা শুধুমাত্র তোমাদের ধ্বংসই কামনা করে। বাস্তবে শত্রুতা তাদের মুখ হতে প্রকাশ হয়ে পড়েছে আর তাদের অন্তরে যা আছে তা আরও ভয়াবহ।" [সুরা আল ইমরান : ১১৮]

খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের এটা সুস্পষ্টরূপে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী কাফের রাষ্ট্রসমূহ। এরাই সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলামানদেরকে বিভক্ত করার জন্য, তাদের ভূমিতে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পৃথিবীতে ইসলামের নেতৃত্ব মাথা তুলে না দাঁড়াতে দেয়ার জন্য ১৯২৪ সালে খিলাফত ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছে। এদেরই পূর্বপূরুষরা শতকের পর শতক ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য ক্রুসেড পরিচালনা করেছে। ইসলামের আবির্ভাবকালে ইসলামবিরোধী যে শক্তিগুলো ছিলো, যথা– মক্কার কাফের নেতৃত্ব এবং তৎকালীন পরাশক্তি রোম ও পারস্য – বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদী কাফের রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে তাদেরই আরো শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ প্রতিরূপ। এসব কাফের শক্তি ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিও ইউনিয়ন, ভারত, ইসরাইল, রাশিয়া এবং ফ্রান্স।

এই সাম্রাজ্যবাদীরা বিশেষতঃ তাদের মোড়ল আমেরিকা ব্যাপক প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে যাতে শুধুমাত্র পুঁজিবাদকেই মুসলিম ভূমিসমূহের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। তারা মুসলিম উম্মাহ'র পুনর্জাগরণ এবং খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র্য একটি একক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে মুসলিমদের পুনরাবির্ভাবের ভয়ে ভীত। সাম্রাজ্যবাদীরা এই ভেবে আতংকিত যে বিশ্বের নেতৃত্বে মুসলিমরা হয়তো আবারো ফিরে আসবে এবং শুধু মুসলিম ভূমিগুলোতেই নয় বরং পুরো বিশ্বের উপরই তাদের বর্তমান প্রভাব ও স্বার্থের অবসান ঘটাবে। এই সত্যটি বুঝতে পেরে আমেরিকাসহ বাকী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহ'কে সুস্পষ্ট লক্ষ্য বানিয়ে পুঁজিবাদকে মুসলিম ভূমিগুলোতে প্রতিষ্ঠিত করার মিশনে নেমেছে। এর পাশাপাশি এই মিশনের আরো যা উদ্দেশ্য তা হলো, প্রাকৃতিক ও বিবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলিম ভূমিগুলোর সম্পদ লাভে আমেরিকা ও অন্যান্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অন্তহীন লোভ ও উচ্চাভিলাষ, মুসলিম ভূমিগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান ও কৌশলগত সুবিধাকে করায়ত্ত করা, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর বিশাল মার্কেটে পরিণত করা এবং নিজেদের শিল্পকারখানা পরিচালনার জন্য মুসলিমদের বিশাল তেল সম্পদ ও অন্যান্য কাঁচামাল হস্ত গত করা।

এসব সাম্রাজ্যবাদী কাফের রাষ্ট্রগুলো নিজেরা সরাসরি অথবা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জোট, অর্থনৈতিক ও সামরিক সংস্থাকে ব্যবহার করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে পৃথিবীতে মুসলমানদের ক্রমাগত শক্তিহীন করার চেষ্টা করছে। একের পর এক তাদের ভূমিগুলোতে হানা দিচ্ছে, রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, তাদের সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের এ সকল কাজে তাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে বর্তমান মুসলিম ভূমিগুলোতে তাদেরই বসানো তাঁবেদার শাসকবর্গ।

এসব জালেম শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে যেমন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তাদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে অন্যদিকে তারা নিজেদের মুসলিম জনগণকে সব ধরণের অধিকার বঞ্চিত করছে। মুসলিমদের সম্পদ বিদেশী দখলদারদের

হাতে তুলে দিয়ে তাদের উপর শোষণ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক হিসেবে মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে পুঁজিবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে; মুসলিমদের উপর কাফেরদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিশ্ব জুড়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে কাফেরদের অনুকূলে একের পর এক দাসত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ করছে, মুসলিম উম্মাহ'কে দূর্বল ও ধ্বংস করার জন্য কাফেরদের সব চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে, এবং জনগণের মধ্যে মুখ বুঝে সয়ে নেয়া বা মেনে নেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে যাচ্ছে যাতে করে কেউ মুখ খুলে সত্য উচ্চারণের সাহস না করে। এতসব বৈরী আচরণের একটাই উদ্দেশ্য আর তা হলো উম্মাহ'কে কুফর ও কাফেরদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করা।

অতএব, খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের জন্য সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের এবং তাদের তাঁবেদার শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করা অপরিহার্য যেন এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো থেকে সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ভিতগুলোর মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়।

এই আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দেশীয় রাষ্ট্রদূত বা কূটনৈতিক কতৃক সংলাপকে উৎসাহিত করা, রাজনৈতিক সংস্কার সাধন, সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির নামে মুসলিম দেশগুলোর আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে যেকোন ধরণের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। একই সাথে ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যখন কোন অযৌক্তিক বা মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদিত হয় সেগুলো বাতিল করার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হবে। ভারত-মার্কিন-ইইউ-ইসরাইল তথা কোন শত্রু রাষ্ট্রের সাথে কোন ধরনের সামরিক চুক্তি কিংবা ট্রানজিট ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কেননা এসব হস্তক্ষেপ, চুক্তি বা সমঝোতার একটা মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেও দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী কাফেরদের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তা চালিয়ে যাওয়া অথচ আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) স্পষ্টতই মুসলমানদেরকে এটা অনুমোদন করতে নিষেধ করেছেন এই বলে যে,

"আলাহ্ কখনোই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।"
[সূরা নিসা : ১৪১]

আন্দোলনকারীদেরকে এই সংগ্রামে দেশীয় অর্থনীতির উপর সম্রাজ্যবাদী কাফেরদের অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপকে প্রত্যাখ্যানের জোরালো আহ্বান জানাতে হবে। তাদের মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে মুসলিমদের উপর। মুক্তবাজার অর্থনীতি আমাদের নিজস্ব অর্থনীতিকে উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে পরিণত হতে বাধা দেয় বৃহৎ শিল্প স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে যার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী ধনী রাষ্ট্রগুলো আমাদের দেশের উপর তাদের অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক আধিপত্য বজায় রাখে, আমাদেরকে তাদের পণ্যের বাজারে পরিনত করে এবং পরিণামে মুসলিম জনগণ ও তাদের ভূমির উপর কাফেরদের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমানদের অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের (যেমন আই.এম.এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এ.ডি.বি. ইত্যাদি) যে কোন ধরণের খবরদারী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সকল প্রকার অসম বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি বাতিল করার জন্য শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনে নামাতে হবে। একইভাবে মুসলমানদের জ্বালানী সম্পদ তেল-গ্যাস-কয়লা-ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ কখনোই বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়া যাবেনা। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন, *"তিনটি জিনিষের মাঝে সকল মানুষ শরীক। এগুলো হচ্ছে পানি, চারণ ভূমি এবং আগুন।"* সুতরাং, জ্বালানী হচ্ছে গণমালিকানাধীন একটি সম্পদ এবং এ সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে। মোটকথা, আন্দোলনকে এমনভাবে সুসংগঠিত করতে হবে যেন সাম্রাজ্যবাদী এসব কোম্পাানীকে এদেশ থেকে চিরতরে বের করে দেয়া যায় এবং আমাদের নিজেদের সম্পদের উপর নিজেদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী হতে হবে জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী কাফের শক্তির বিরুদ্ধে সচেতন করা ও তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং তাদের দেশীয় তাঁবেদার শাসকদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে গণআন্দোলন ও গণপ্রতিরোধের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে তাদেরকে অপসারণ করা। সেমিনার, লিফলেট, পোস্টার, বক্তৃতা, সমাবেশ, মিছিল, ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজ দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদীদের সব নতুন নতুন পরিকল্পনা ও চুক্তির মুখোশ উন্মোচন করে তা তুলে ধরতে হবে জনগণের সামনে, দেখিয়ে দিতে হবে কীভাবে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে তারা, কীভাবে তাদের ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে, কীভাবে তাদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের থাবা বিস্তার করছে ক্রমান্বয়ে। একই সাথে জনগণকে আহ্বান করতে হবে এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার, নিজেদের ভূমিতে তাঁবেদার শাসকদের প্রত্যাখ্যান করার, তাদের যে কোন দেশবিরোধী-গণবিরোধী-ইসলামবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার।

যখন সাম্রাজ্যবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ও তাদের বসানো তাঁবেদার শাসকদেরকে জনগণ নিজেদের ও ইসলামের চরম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে এবং এদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও সংগঠিত হয়ে এদের কাছ থেকে মুক্তির পথ খুঁজবে তখনই সেই জনগণকে নিয়ে একটি গণ-আন্দোলন পরিচালনা করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে তাদের নিয়ে যেতে হবে। এই খিলাফত তাদেরকে জালেম শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করবে, তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে এবং একই সাথে ঐ শক্তিশালী খিলাফত রাষ্ট্র পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলামানদের চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদী কাফের রাষ্ট্র ও শক্তিগুলোর বিদায় ঘন্টা বাজাবে যাতে করে পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র বিজয়ী জীবনব্যবস্থা হিসেবে কতৃত্ব করতে পারে।

অধ্যায় ৬ – ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীর গুণাবলী

১. ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর গুণাবলী

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।" [সূরা আলি ইমরান : ১১০]

তিনি আরো বলেন,

"তার চেয়ে উত্তম কথা কার, যে মানুষকে আলাহ্'র প্রতি আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলেঃ আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভূক্ত।" [সূরা হা-মীম আস সিজদাঃ ৩৩]

প্রথম আয়াতে মুসলিমদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলা হয়েছে এবং তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে তারা বাকী মানবজাতিকে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে - অতএব বোঝা গেলো, এ কাজ একটি শ্রেষ্ঠত্বসূচক কাজ।

দ্বিতীয় আয়াতে আলাহ্'র দিকে আহ্বান তথা ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর কথাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। অতএব, ইসলামের একজন দাওয়াত-বহনকারী এমন একটি কাজ করছে যেটি ব্যক্তি ও জাতিগতভাবে একটি শ্রেষ্ঠত্বসূচক ও সর্বোত্তম কাজ। এমন একটি কাজের দায়িত্ব বহনকারীকে অবশ্যই বেশকিছু গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।

প্রথমতঃ ইসলামের দাওয়াতকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং ইসলামকে সমাজে ফিরিয়ে আনা এটা হতে হবে তার জীবনে মূল কেন্দ্রবিন্দু। এটাকে ঘিরেই সাজাতে হবে তার অন্য সব কর্মকান্ড যেমন : জীবিকা, পেশা, পড়াশোনা, বিয়ে, জীবন-যাপনের মান ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে একদিকে যেমন সে শারী'আহ্ নির্ধারিত হালাল-হারামকে সুস্পষ্টভাবে মেনে চলবে তেমনি অন্যদিকে এমনভাবে এগুলোকে বিন্যস্ত করবে যাতে করে এগুলোর কোনটা তার দাওয়াত কার্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। তার প্রধান লক্ষ্য থাকতে হবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং আর সব কিছুকে এ লক্ষ্য অর্জনের সহায়করূপে সাজাতে হবে। আলাহ তাআলা বলেন,

"যদি তোমাদের পিতারা, তোমাদের পুত্ররা, তোমাদের ভাইরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের আত্মীয়রা, আর ঐসব সম্পদ যা তোমারা অর্জন করেছো আর ঐ ব্যবসা যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছো অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছো, (এসব কিছু যদি) আলাহ্ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে সংগ্রাম করার

চেয়ে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আলাহ্ তাঁর (শাস্তির) নির্দেশ পঠিয়ে দেন।" [সূরা তওবা : ২৪]

দ্বিতীয়তঃ তার ব্যক্তিগত চরিত্র ও আমলে সে হওয়া উচিত সবার অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। কেননা, মানুষ একজনের কথা শুনে যতটুকু উদ্বুদ্ধ হয় যার চেয়েও বেশী উদ্বুদ্ধ হয় তার কাজে। তদুপরি কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য পেলে মানুষ কথাও গ্রহণ করতে চায়না। অতএব সে মানুষকে যা বলবে সর্বাগ্রে তার নিজের মাঝেই সেটা থাকা উচিত। আলাহ্ তা'আলা বলেন,

"তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজে আদেশ করছো এবং তোমাদের নিজেদের বেলায় ভুলে থাকছো?" [সূরা বাক্বারা : ৪৪]

তৃতীয়তঃ তাকে চিন্তাভাবনা করে এবং লক্ষ্য ঠিক করে কাজ করতে হবে। একইসাথে তাকে তার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা এবং বাস্তবে সে ফল লাভ করছে কিনা সবসময় সেটা হিসেব-নিকেশ করে দেখতে হবে। কেবল আবেগ নির্ভর কিন্তু চিন্তাহীন, লক্ষ্যহীন কাজে কোন ফল আসে না। লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর নূন্যতম সময় এ দুটি নির্ধারণ না করে এমনি এমনি কাজ করতে থাকলে কাজে গতিশীলতাও আসবে না। আবার, একটি কাজ একভাবে করে ফললাভ হচ্ছে কিনা তা নিয়ে সচেতন না থাকলে ফললাভ করার অন্য উপায়ের চিন্তাও মাথায় আসবে না। রাসূলুলাহ (সাঃ) বলেন,

"প্রতিটি বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে গ্রহণ করবে। যদি এর পরিণাম উত্তম মনে হয়, তবে তা করবে।" (মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

"সুচিন্তিত কর্মপন্থার সমতুল্য কোনও বুদ্ধি নেই।" (মেশকাত)

লক্ষ্য ঠিক করার পাশাপাশি আরো যে গুণটি থাকা দরকার তা হলো লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় সংকল্প। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে লক্ষ্যে পৌঁছার। দৃঢ় সংকল্প না থাকলে সে লক্ষ্য স্থির করার পরও ধীরগতিতে চলতে থাকবে।

চতুর্থঃ তাকে চিন্তাশীল ও সৃষ্টিশীল হতে হবে। অর্থাৎ মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতির উদ্ভাবক হতে হবে। তাহলে সে সব ধরণের পরিস্থিতি ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াত কার্যে সর্বোচ্চ ফল লাভ করতে পারবে। এর পাশাপাশি তাকে বিচক্ষণ হতে হবে এবং দাওয়াহ'র পথে একই ভুল যাতে বারবার না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"মু'মিন কখনো একই গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।" (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ, পুনঃ পুনঃ একই ভুল করেনা।

তার দাওয়াতের পদ্ধতি হওয়া উচিত হৃদয়গ্রাহী ও সবার বোধগম্য। আর এটা তখনই সম্ভব যখন সে প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা বাস্তবতা বুঝবে। তখন সে যার যার বাস্তবতা অনুযায়ী তার কাছে ইসলামকে উপস্থাপন করতে পারবে। তা নইলে তার দাওয়াত হবে প্রভাবশূন্য এবং তা মানুষকে বিরক্ত করবে। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"মানুষকে তোমার রবের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর ভাষার মাধ্যমে।"
[সূরা নাহল : ১২৫]

রাসূলুলাহ (সাঃ) বলেন,

"লোকের সাথে এমন কথা বলো যা তারা বোঝে, আর যা বোঝে না তা ত্যাগ কর।" (বুখারী)

পঞ্চম : তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী থাকতে হবে। তাহলে সে লোকজনকে দাওয়াতের মাধ্যমে জয় করার পর তাদেরকে একসাথে ধরে রাখতে পারবে। সে যদি লোকজনকে নেতৃত্ব দিয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে না পারে তাহলে তার দাওয়াতের চূড়ান্ত ফল লাভে সে সক্ষম হবে না। তাছাড়া, তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী না থাকলে সমাজের লোকজান তার পিছনে সমবেত হতে ভরসা পাবে না।

ষষ্ঠ : তাকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। এই সাহস হতে পারে যে কোন পরিস্থিতিতে সত্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে, অন্যায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অথবা যেকোন বাধার মুখে সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের বাণীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে। দূর্বলতা, ভীরুতা, কাপূরুষতা – এসব তার চরিত্র থেকে দূর করতে হবে। দূর্বলচিত্ত, ভীরু, কাপূরুষ কখনো ইসলামের নেতৃত্ব দিতে পারবে না, কেননা এপথে অনেক বিপদাপদ ও পরীক্ষা রয়েছে। রাসূলুলাহ (সাঃ) বলেন,

"(একজন) ব্যক্তির মধ্যে যা খারাপ তা হলো কৃপণতাময় লোভ এবং কাপূরুষতা।" (আবু দাউদ, আহমদ)

সপ্তম : তাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। কেননা, একাজে অনেক বাধা-বিপত্তি, নিন্দা, অপমান, নির্যাতন এবং পার্থিব ক্ষতি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে, দিনের পর দিন কাজ করার পরও কাঙ্খিত ফল না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। ধৈর্য ছাড়া এসবকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সে যদি কারো কটু কথায় সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে তবে সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। তার স্মরণ করা উচিত যে স্বয়ং রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবী (রা.)-দের এ কাজ করতে গিয়ে কতো কটুক্তি ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। হতাশা আসতে চাইলে তার স্মরন করা উচিত নূহ (আঃ) কে যিনি তাঁর সম্প্রদায় কতৃক ক্রমাগত প্রত্যাখ্যাত হয়েও একটানা নয়শত বছর তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে আহ্বান কার্য চালিয়ে গেছেন।

অষ্টম : সে হবে সবার বিশ্বস্ত। তার ব্যাপারে মানুষের মাঝে যেন এমন কোন সন্দেহ কাজ না করে যে সে প্রতারণা করতে পারে বা ইসলামের দিকে আহ্বানের পিছনে তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, সে বিপদের মাঝে ছেড়ে দিয়ে পালাবে ইত্যাদি। যদি সে ওয়াদা রক্ষাকারী ও আমানতদারী এদুটি গুণের পরিচয় দিতে পারে তাহলেই সে পারবে লোকের মাঝে এরূপ বিশ্বাস অর্জন করতে। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"যার মধ্যে আমানত নেই তার মধ্যে ঈমানও নেই, আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি পালনের গুণ নেই, তার মধ্যে দ্বীনও নেই।" (বুখারী)

নবম : ঘরে বাইরে তাকে হতে হবে দায়িত্বশীল। তার আশেপাশের মানুষদের খোঁজ খবর নেয়া, তাদের যথাসাধ্য দেখাশুনা করা ও প্রয়োজনে সাহায্য করা হওয়া উচিত তার অভ্যাস। তাহলে তার দাওয়াত তাদের মনে রেখাপাত করবে। হযরত আবু বকর (রা.) একই দিনে রোযা রেখেছেন, দরিদ্রকে সাহায্য করেছেন, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছেন আবার দ্বীনের দাওয়াতও চালিয়ে গেছেন। এরকমই হওয়া উচিত দাওয়া-বহনকারীর বৈশিষ্ট্য।

দশম : দ্বীনের দাওয়াত বহনে তাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে কিন্তু নম্রতার সাথে। মানুষের প্রতি তার নম্রতা, ভালোবাসা এবং তাদেরকে হেদায়েতের আলোতে আনার জন্য ব্যকুলতা এসব তার অন্তরে থাকা অপরিহার্য। তাহলে সে মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে। কঠোরতা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয় অথচ মানুষকে কাছে টানা এবং তাদের ধরে রাখা একজন দাওয়াত-বহনকারীর অন্যতম কাজ। আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"আলাহ্'র অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯]

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"নিশ্চয়ই আলাহ্ দয়াশীল, প্রত্যেকটি বিষয়েই নম্র ব্যবহার তিনি পছন্দ করেন। নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারের ফলে তিনি যা দান করেন কঠোরতার কারণে তা দেন না।" (বুখারী)

হাদীসে উলেখ রয়েছে যে, রাসূলুলাহ্ (সাঃ) যখন একাধিক ব্যক্তির সাথে একত্রে কথা বলতেন তখন প্রত্যেকেই মনে করতো যে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) তার প্রতিই সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন।

পরিশেষে : সবসময়ই তার কাজে সফলতা দেয়ার জন্য আলাহ্'র কাছে প্রার্থণা করা উচিত। কখনোই নিজের মেধা ও প্রচেষ্টার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে আলাহ্'র সাহায্য কামনা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, কাজের ফল লাভ কেবলমাত্র আলাহ্'রই হাতে, অতএব তাঁর সাহায্য ছাড়া কখনোই সফলতা আসবে না। কাজেই সে সদাসর্বদা বিনয়ের সাথে বিগলিত চিত্তে আলাহ্'র কাছে সাহায্যপ্রার্থী ও নত থাকবে।

এমনই হওয়া উচিত একজন দাওয়াহ-বহনকারীর গুণাবলী। এমন মু'মিনদের ও দাওয়াহ-বহনকারীর বৈশিষ্ট্য উলেখ করতে গিয়ে আলাহ্ তা'আলা বলেন,

"নিশ্চয়ই আলাহ্ মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন ... তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আলাহ্'র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী রুকু ও সিজদাহ'কারী, সৎকাজের নির্দেশ দানকারী ও অসৎকাজে নিষেধকারী এবং আলাহ্'র সীমাসমূহের (হালাল-হারামের) সংরক্ষনকারী; আর তুমি এমন মু'মিনদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" [সূরা তওবা : ১১২]

যদি একজন দাওয়া-বহনকারী উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট হয়। তবে আশা করা যায় সে হবে দ্বীনের একজন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দায়ী। আর আমরা যদি তেমন হতে পারি তবে আলাহ্ তা'আলা আমাদের এ বলে ওয়াদা দিয়েছেন যে,

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আলাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেনই, যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।" [সূরা নূর : ৫৫]

২. ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর দৈনন্দিন কার্যাবলী

ইসলামের দাওয়াত বহনে উদ্বুদ্ধ একজন যখন চিন্তা করে দেখবে যে কত শ্রেষ্ঠতম বিষয় সে বহন করছে, কত বড় আমানত সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তখন এ কাজের জন্য নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করা তার অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর নিজেকে এজন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে তার দৈনন্দিন কাজগুলোকে এ লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী করে সাজাতে হবে।

ইসলামের দাওয়াত বহনকারীরকে উপলব্ধি করতে হবে যে তাঁর বহনকৃত বিষয়টি কত ভারী। এটাও তাকে বুঝতে হবে যে কত বড় বড় বাধা রয়েছে এ পথে যেগুলো অতিক্রম করে তাকে গন্তব্য পৌঁছতে হবে। একজন দাওয়াত বহনকারীকে নিজের বর্তমান অবস্থা ও দূর্বলতাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে; নিজের কোন্ কোন্ বিষয়গুলোকে ঠিক করতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জনে আরো কতটুকু সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে তাকে তা চিহ্নিত করতে হবে। তার প্রতিদিনের কাজের তালিকায় ঐ কাজগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যেগুলো তার বর্তমান দুর্বলতা ও অদক্ষতাগুলো কাটিয়ে ইসলামের দাওয়াত বহনে ক্রমান্বয়ে তাকে অধিকতর যোগ্য করে তুলবে। নিম্নের বিষয়গুলোকে সাধারণভাবে একজন দাওয়াত-বহনকারী তার দৈনন্দিন কাজের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে:

প্রথমত: প্রতিদিনই আলাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সে সদা সচেষ্ট থাকবে। এর মানে হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে শারী'আহ্'র সমস্ত

ফরযগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করা, হারামগুলো পুরোপুরি বর্জন করা এবং যথাসাধ্য নফল ইবাদত করা ।

দ্বিতীয়ত: তাকে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কুর'আন তেলাওয়াত করতে হবে। এই কুর'আনের বাণী সে অন্যের কাছে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, একে সে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, সে নিজেই যদি কুর'আন পাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে কীভাবে হবে? এছাড়াও দাওয়া-বহন করতে গিয়ে সমাজে যে বাধা, অপমান ইত্যাদির সম্মুখীন হতে হয়, যে মানসিক যাতনা তৈরী হয় কুর'আন পাঠে তা অপসারিত হয়। কুর'আন অন্তরকে প্রশান্ত করে। তার উচিত হবে কুরআনকে অর্থসহ পড়া, এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা এবং তাফসীর অধ্যয়ন করা।

তৃতীয়ত: অবশ্যই তার দৈনন্দিন কাজের অন্যতম অংশ হবে বাস্তবে এই দাওয়াতকে আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেয়া, আরো কার কাছে নেয়া যায় তার সুযোগ অনুসন্ধান করা। পরিচিত-অপরিচিত, বন্ধু, আত্মীয়, কর্মস্থলের সহকর্মী প্রত্যেকের কাছে কীভাবে এই দাওয়াত নিয়ে যাওয়া যায় এ সুযোগ খুঁজে বের করতে সে সদা সচেষ্ট থাকবে। ইসলামের আহ্বানকে সমাজের কাছে নানা উপায়ে পৌঁছে দেয়ার চিন্তাই তার সারাদিনের প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত।

চতুর্থ: তাকে অবশ্যই প্রতিদিনকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরাখবর জানতে হবে এবং এর ভিত্তিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষণ দাঁড় করাতে হবে। এটা এজন্য যে, তার পুরো কাজটাই রাজনৈতিক কাজ যার অংশ হচ্ছে জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের দূর্বল করে ফেলা এবং ইসলামের শত্রুদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া। এই কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবেনা যদি না সে তাদের প্রতিদিনকার নিত্য নতুন অপকর্ম, জুলুম এবং জনগণের ব্যাপারে তাদের ক্ষতিকর পরিকল্পনা সমূহের ব্যাপারে সর্বশেষে সংবাদের খোঁজ না রাখে। ফলশ্রুতিতে, সে জনগণের সাথে ঐভাবে জনসংযোগ করতে পারবেনা যা দিয়ে সে জনগণকে শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে এবং তাদেরকে দ্রুত আন্দোলনে নামাতে পারে। উপরন্তু, এর ফলে সে যথা সময়ে যথোচিত কাজ সমাধা করতেও ব্যর্থ হবে এবং এমন সব সুযোগ হারিয়ে ফেলবে যার সদ্ব্যবহার করতে পারলে অল্প সময়েই সে তার দাওয়াত ও আন্দোলনকে এক ধাপে অনেকদূর এগিয়ে নিতে পারতো। তাকে মনে রাখতে হবে যে, রাজনীতিতে একটা মাত্র দিনও অনেক লম্বা সময় যাতে পিছিয়ে পড়া যাবেনা কখনোই।

পঞ্চম: তার দৈনন্দিন কাজের একটি অংশ থাকবে ইসলামী জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য। কেননা ইসলামী জ্ঞান ছাড়া অন্যের কাছে সঠিকভাবে ইসলামকে পৌঁছানো অসম্ভব। তাই নির্ভরযোগ্য ইসলামের বিভিন্ন শাখায় নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করবে এবং এটা দিয়ে তার দাওয়াত ও প্রচারকে সমৃদ্ধ করবে।

ষষ্ঠ: প্রতিদিন রাতে সে শোয়ার পূর্বে একটি সময়কে নির্দিষ্ট করে নিবে যখন সে তার সারাদিনের সমস্ত কাজগুলো হিসাব-নিকাশ করবে। কী তার করার কথা ছিল কিন্তু করেনি,

কোন কাজটি করেও লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, কোন কাজে ভুল-ত্রুটি বা চিন্তার অভাব বা অলসতা ছিল, ব্যক্তিগত ইবাদতে কি কি ত্রুটি হয়েছে এসব সে খুঁজে বের করবে এবং পরবর্তী দিন কীভাবে এসবকে ঠিক করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করবে। এভাবে সে উত্তরোত্তর তার কাজে উন্নতির দিকে ধাবিত হবে। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"ধ্বংস তার জন্য যার আজকের দিন গতদিনের চেয়ে উত্তম নয়।"

এই হচ্ছে একজন দাওয়াহ-বহনকারীর দৈনন্দিন জীবন। এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দাওয়াহ-বহনকারীদের অর্থাৎ সাহাবাদের (রা.) দৈনন্দিন জীবনকে অধ্যয়ন করতে হবে। তাঁরা এরূপই ছিলেন। আর আমরা যদি অনুরূপ ভাবে আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো সাজাই তাহলে তাঁরা যেমন দুনিয়াতে ইসলামকে বিজয়ী করে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং আখেরাতে পুরস্কৃত হবেন - আমরাও একইভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান লাভ করতে পারবো, ইনশাআলাহ্।

৩. ইসলামের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রাম

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদেরকে অনেক ত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার; এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। সম্পদ, পরিবার ও প্রাণের মূল্যে পাড়ি দিতে হবে এই দুর্গম পথ। বিশ্বাসীরা এই পথ অতিক্রমের সময় নিদারুণ যন্ত্রণায় পতিত হবে আর এর মাধ্যমেই আমাদের প্রভূ আমাদের ভেতর থেকে ভালকে মন্দের কাছ থেকে পৃথক করে নিবেন।

আলাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

"ঐ সব লোকরা কি ধারণা করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তারা অব্যাহতি পাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে, সুতরাং আল্লাহ্ সেই লোকদেরকে জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী ছিল এবং জেনে নিবেন মিথ্যাবাদীদেরও।" [সূরা আনকাবুত: ২-৩]

নবী, রাসূল ও তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছেন তারা সবাই দুঃখ, কষ্ট ও সীমাহীন কাঠিন্য দ্বারা তীব্রভাবে পরীক্ষিত হয়েছেন। তারা যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন আল্লাহ্ তা কুর'আনে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

"তোমরা কি মনে কর যে, (বিনা শ্রমে) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটেনি যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে; তাদের উপর এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ এসেছিল এবং তারা এমন প্রকম্পিত হয়েছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও

তাঁর মু'মিন সাথীরাও বলে উঠেছিল, আল্লাহ্'র সাহায্য কখন আসবে? স্মরণ রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র সাহায্য নিকটেই।" [সূরা বাকারা : ২১৪]

আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নিয়মই হচ্ছে যে দুঃখ, কষ্ট, সংকট ও কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করার পূর্বে তিনি স্বস্তি ও বিজয় দেন না। কাজেই, যারা ইসলামের বাণী বহন করবে দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, দারিদ্র, সীমাহীন কঠিন পরিস্থিতি ইত্যাদি তাদেরকে ঘিরে রাখবে এটাই স্বাভাবিক। অত্যাচারী স্বৈরশাসকদের ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ইত্যাদি যেন কিছুতেই বিশ্বাসীদেরকে এই পবিত্র কাজ থেকে বিরত না রাখে এবং তাদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল না করে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, একটা চরম অসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি তার রাসূলদের প্রতিও সাহায্য আর বিজয় পাঠাননি।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন,

"অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং তাদের ধারণা জন্মাল যে, আমাদের বুঝের ভুল হয়েছে, তখনই তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছাল।" [সূরা ইউসুফ : ১১০]

হযরত আদম (আঃ) থেকেই হক্ক ও বাতিলের, ইসলাম ও কুফরের যে দ্বন্ধ চলে আসছে তা নিরন্তর সংগ্রামেরই ইতিহাস। প্রত্যেক নবী ও সত্যপন্থীরাই নিজ নিজ যুগে যুগে বিরুদ্ধ শক্তির সাথে কঠোর সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমান যুগেও এর ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। তাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনকারীদের এ পথে মরণপণ সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

প্রথমত: ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে সর্বপ্রথম পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেই বাধা আসতে পারে। পরিবারের লোকদের ভিন্ন মন-মানসিকতা কিংবা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিরূপ মনোভাব যে কোন কিছুই হতে পারে এ বাধার কারণ। এ বাধা হতে পারে কেবল মুখে বা তিরস্কারে কিংবা আরো সরাসরি। রাসূলুলাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক বাধা তাদের নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেই এসেছিল। তাঁরা ধৈর্যের সাথে সেটাকে অতিক্রম করেছিলেন এবং ক্রমাগত তাদের বুঝিয়ে গেছেন। রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর প্রতি তাঁর চাচা আবু জেহেল ও কুরাইশ বংশের অন্যান্য আত্মীয়রা সীমাহীন কটুক্তি, লাঞ্ছনা ও শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে ছিলো। মুসআব বিন উমায়র (রা.) এর মা তাকে বেঁধে রেখেছিল যাতে তিনি রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর কাছে না যেতে পারেন। সা'দ (রা.) এর মা মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে তাঁকে মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীন ত্যাগ করতে বলেছিলেন। হযরত উমর (রা.) নিজে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার বোন ফাতিমা (রা.) ও ভগ্নিপতি সাঈদকে (রা.) ইসলাম গ্রহণের জন্য পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছেন। এছাড়াও যে সমস্ত দাস ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কাফের মনিবরা অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল তাদের উপর। বিলাল (রা.)-কে তার মনিব

উমাইয়া ইবনে খালফ ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করতে তাঁর বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে দুপুরবেলা মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রাখতো ।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে আন্দোলনকারীকে ব্যক্তিগত পার্থিব ক্ষতি মেনে নিতে হবে। হয়তো সে আন্দোলন বাদ দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পারতো, কিংবা তার ব্যবসা বা চাকরীতে আরো বেশী সময় দিয়ে বেশী লাভ বা উন্নতি করতো পারতো। এমনও হতে পারে যে আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে তার চাকরী চলে গেলো, বা ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলো। আলাহ্'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে এসব ত্যাগ মেনে নিতে হবে। সে যদি বিশ্বাস রাখে যে রিযিক ও বিপদাপদ এসবই আলাহ্'র কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া তাহলে এ সময় ধৈর্য্য ধারণ তার পক্ষে সহজ হবে। হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলামের কাজ করতে গিয়ে তাঁর এই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অনুরূপে সাহাবীরা (রা.) মক্কায় তাদের বড় বড় ব্যবসা ছেড়ে গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মদীনায় হিজরত করেন।

তৃতীয়তঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে সামাজিক প্রতিরোধ আসতে পারে। এটা হতে পারে নিন্দা, কটুবাক্য কিংবা শারীরিক লাঞ্ছনা ইত্যাদি আকারে। যেমন কেউ ফ্যানাটিক, মৌলবাদী ইত্যাদি বলতে পারে। আন্দোলনকারীদের সাথে বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপত্তি জানাতে পারে, এমনকি সামাজিকভাবে তাদের বয়কটও করতে পারে। এলাকায় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজকে ব্যহত করার জন্য তাদের ভয়ভীতি দেখাতে পারে, মারপিটও করতে পারে। মক্কার সমাজে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে প্রচন্ড সামাজিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। কাফেররা একের পর এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে রাসূলকে (সাঃ) আশ্রয়দাতা আবু তালিবের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি করছিলো তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য। এক্ষেত্রে তারা বাপ-দাদার ঐতিহ্য, মুরুব্বীদের সম্মান, মর্যাদা ইত্যাদির অজুহাত পেশ করেছিলো। এছাড়াও তারা তাদের বখাটে ও দুশ্চরিত্র লোকদের রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। একদিন তারা সকলে একত্রে তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করে; তাঁর উপর উটের ভূড়ি নিক্ষেপ করে ইত্যাদি। মুসলমানদেরকে যদি কেউ আশ্রয় বা নিরাপত্তা দেয় তাকেও তারা বাধ্য করে তা সরিয়ে নিত। কোন সম্ভ্রান্ত ও জনবল সম্পন্ন লোক ইসলাম গ্রহণ করলে আবু জেহেল তাকে বলতো, "তোর মান-মর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত করবো", কোন ব্যবসায়ী ইসলাম নিলে সে বলতো "তোর ব্যবসা শেষ করব ও তোর ধন-সম্পদ ধ্বংস করবো"। (সীরাতে ইবনে হিশাম) এভাবেই তারা নানা সামাজিক বাধা আরোপ করতো।

চতুর্থতঃ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীকে রাষ্ট্রীয় বাধার মুখোমুখি হতে হবে। এ বাধার স্তরগুলো হতে পারে নিম্নরূপ:

মিডিয়া প্রচারণাঃ ইসলামের জন্য আন্দোলনকারীদের জঙ্গী, রাষ্ট্রদ্রোহী, ক্ষমতালোভী, বর্বর ইত্যাদি বলে প্রচার করা যাতে তাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করা যায়। মক্কায় রাসূলুলাহ্ (সাঃ)

এর বিরুদ্ধে তারা কবি, গণক, পাগল, জাদুকর, ক্ষমতালোভী ইত্যাদি মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে মানুষকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতো।

ইসলামের আন্দোলনে নিষেধাজ্ঞাঃ সমাজের মানুষের কাছে যেন এই দাওয়াত না পৌঁছায় এজন্য আন্দোলনকারীদেরকে নিষিদ্ধ করা হতে পারে এবং জনগণের সাথে তাদের সম্পৃক্ততায় নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। মক্কায় রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের তিন বছরের জন্য একটি উপত্যকায় বয়কট করে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। অনুরূপে, ইবনে দাগিন্না যখন আবু বকরকে (রা.) নিরাপত্তার আশ্রয় দেয়, তখন তাঁর উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ শুনে মক্কার নারী-পূরুষরা আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে তারা উচ্চ স্বরে কুর'আন পাঠকেও নিষিদ্ধ করে। আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রকাশ্যে কুর'আন পাঠ করায় তারা একযোগে তাঁকে প্রহার করে। এভাবে বিভিন্ন উপায়ে তারা তাদের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে পারে।

প্রলোভনঃ আন্দোলনকারীদের কোনভাবেই দমন করা না গেলে শেষ চেষ্টা হিসেবে তাদেরকে প্রলোভিত করে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা হতে পারে - তাদেরকে বড় অংকের টাকা দেয়া, অন্য দলে টেনে নিয়ে বড় কোন পদ দেয়া, তাদেরকে নিজেদের জোটে টেনে আনা ইত্যাদি। মক্কায় কাফেররা কোনক্রমেই রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে থামাতে না পেরে পরিশেষে এই প্রস্তাব নিয়ে আসে যে, "তুমি নেতৃত্ব চাইলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা হিসেবে মেনে নিচ্ছি, সুন্দরী নারী চাইলে কুরাইশদের যে কোন ঘর থেকে পছন্দমত তোমাকে দশজন নারী বেছে নেয়ার প্রস্তাব দিচ্ছি, সম্পদ চাইলে যে কোন কুরাইশের চেয়ে তোমাকে ধনী বানিয়ে দিচ্ছি" এবং এসবের বিনিময়ে তিনি যেন তাঁর ইসলাম প্রচার থামান। কিন্তু রাসূলুলাহ্ (সাঃ) এসবকিছুই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কঠোর নির্যাতন/হত্যার প্রচেষ্টাঃ সবকিছু ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের উপর কঠোর নির্যাতন এমনকি তাদেরকে হত্যা প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তাদের উপর নেমে আসতে পারে মামলা, রিমান্ড, গ্রেফতার, জেল, হাজতবাস, নির্যাতন, এরূপ আরো অনেক কিছু। স্বয়ং রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে একাধিকবার কুরাইশরা হত্যার চক্রান্ত করেছিলো। একবার তারা তাঁর চাচা তালিবের কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে আসে যে তিনি যেন কুরাইশ বংশের অন্যকোন সুদর্শন, সুঠাম যুবকের বিনিময়ে মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাদের হাতে তুলে দেন এবং তারা তাঁকে হত্যা করবে। হিজরতের রাতে কুরাইশরা তাদের সবগোত্র থেকে একজন করে নিয়ে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে হত্যার উদ্দেশ্যে একত্র হয়। ইসলাম গ্রহণের কারণে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী (রা.)-কেও তারা হত্যাও করেছিলো।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের সামনে এসবই একযোগে আসতে পারে । এসব পরিস্থিতিতে ভয় পেলে বা টলে গেলে তাদের চলবেনা, বরং এটাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পথ – এটা তাদেরকে বুঝতে হবে। সাহাবা (রা)-রা যখন এসব মর্মান্তিক

নির্যাতনের শিকার হয়ে রাসূলুলাহ (সাঃ) এর কাছে এ সব থেকে নিস্কৃতির জন্য আলাহ্'র কাছে প্রার্থনার জন্য বললেন, তখন উত্তরে তিনি বললেন,

"তোমাদের পূর্বযুগে (আলাহ্'র দ্বীন গ্রহণের কারনে) এমন হয়েছে যে, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে তার মাথা করাত দিয়ে কেটে দু'টুকরো করা হয়েছে, লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীর থেকে হাড্ডি-মাংস আলাদা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বের সে তার দ্বীন ত্যাগ করেনি।" (বুখারী)

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনকারীর উচিত এ পথে তার সব ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ক্রমবৃদ্ধিকে বিজয় নিকটবর্তী হবার চিহ্ন এবং আলাহ্'র সাথে তাঁর নৈকট্য বৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতির সিঁড়ি হিসেবে দেখা। তবেই তার জন্য সহজ হবে সহজে এসবকে অতিক্রম করে বিজয় অর্জন করা।

৪. ইসলামের দাওয়াত বহনকারীর পুরস্কার

বর্তমান যুগে যারা সত্যিকারভাবে ইসলামের দাওয়াত বহণ করবে এবং মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবার পর যারা আবার মানুষের মাঝে ইসলামকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে, ইসলামের অধিকাংশ শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে প্রায় অপরিচিত হয়ে পড়ার পর যারা আবার এটাকে পুণরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করবে তাদের জন্য কুর'আন ও হাদীসে অসংখ্য শুভ সংবাদ ও অতি উচ্চ পুরষ্কারের কথা বলা হয়েছে।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"তোমার দ্বারা আলাহ্ একটি মাত্র লোককেও হেদায়েত দিলে, তা দুনিয়া এবং তার সমস্ত জিনিসের চেয়ে উত্তম হবে।" (আহমদ)

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"কোন ব্যক্তি হেদায়েতের পথে আহ্বান করলে সে (ঐ আহ্বানে সাড়াদানকারী) অনুসারীদের সমপরিমান সওয়াব পাবে, তবে অনুসারীদের সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হবে না।" (মুসলিম)

অতএব, একজন দাওয়াত বহনকারীর আহ্বানে কোন লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হলে এবং ঐ লোকের মাধ্যমে অন্যরা হেদায়েত পেলে সকলের সওয়াবই প্রথম দাওয়াত বহনকারী পেতে থাকবে।

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"যে ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্য জ্ঞানার্জন করে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে তার ও নবীগণের মধ্যে জান্নাতে মাত্র এক ধাপের ব্যবধান থাকবে।" (তিরমিযী, দারিমী)

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"ইসলাম অপরিচিত অবস্থা শুরু হয়েছিল অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে, সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।" তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কারা এই অপরিচিতরা ইয়া রাসূলুলাহ্ (সাঃ)?' তিনি (সাঃ) বললেন, "ওরা তারা যারা মানুষ আমার সুন্নাহকে নষ্ট করে দিলে সেটাকে বিশুদ্ধ করবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তারা হচ্ছে ওরা যারা মানুষ খারাপ হয়ে যাবার পরা তাদেরকে ঠিক করবে।" (তাবারানী)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"শেষ বিচারের দিন এমন কিছু লোককে উপস্থিত করা হবে যাদের নূর হবে সূর্যের মতো।" আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কি আমরা, ইয়া রাসূলুলাহ (সাঃ)?' তিনি বললেন, "না তোমাদের জন্য বিশাল পুরষ্কার রয়েছে আর তারা হচ্ছে কিছু সংখ্যক দরিদ্র দেশত্যাগী যারা উত্থিত হবে পৃথিবীর সব অঞ্চল থেকে।" তারপর তিনি (সাঃ) বললেন, "কল্যান হোক অপরিচিতদের (তিনবার)।" জিজ্ঞেস করা হলো, 'কারা সেই অপরিচিতরা?' তিনি (সাঃ) বললেন, "তারা হবে অনেক খারাপ লোকের মাঝে অল্পসংখ্যক সৎ লোক। তাদের মান্যকারীর চেয়ে তাদের অমান্যকারীদের সংখ্যা বেশী হবে।" (তাবারানী)

রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা আলাহ্'র হুকুমের উপর অটল থাকবে। যারা তাদের সাহায্য করা পরিত্যাগ করবে অথবা তাদের বিরোধীতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। এ অবস্থায় আলাহ্'র নির্দেশ এসে যাবে এবং তারা মানুষের (বিরোধীদের) উপর বিজয়ী হবে।" (মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

"নিশ্চয়ই তোমাদের (সাহাবাদের) পর এমন দিনকাল আসবে, যখন আলাহ্'র দেয়া জীবনব্যবস্থার অনুসারীকে হতে হবে খুবই ধৈর্যশীল ও সহনশীল। আর তাঁর প্রতিদান হবে পঞ্চাশ জনের প্রতিদানের সমান।" তখন সাহাবাগন (রা.) প্রশ্ন করলেন, 'হে আলাহ্'র রাসূল (সাঃ) তাদের থেকেই (পঞ্চাশ জনের সামনে) নাকি?' রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বললেন, "না বরং তোমাদের মধ্যে থেকে (পঞ্চাশ জনের সমান)।" (তিরমিযী আবু দাউদ)

উপরোক্ত সম্মান অর্জনের জন্য যে কোন মুসলিমেরই লালায়িত হওয়া উচিত এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সঠিক দলের সাথে অবিলম্বে যোগদান করা উচিত। এ পথে যত ত্যাগ

ও সংগ্রামই আসুক না কেন এর পরিণামে আলাহ্'র কাছে মর্যাদা ও পুরষ্কার এত বেশী যে সমস্ত ত্যাগ আর সংগ্রামই তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুলাহ্ (সাঃ) বলেন,

"শেষ বিচারের দিন কিছু লোককে আনা হবে যাদের ঈমান এমন অসাধারণ হবে যে তাদের দ্যুতি তাদের বুকে ও ডান হাতে জ্বল জ্বল করতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, 'আজকে তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তোমাদের কল্যাণহাক। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর চির দিনের জন্য।' তাদের প্রতি আলাহ্'র এই ভালবাসা দেখে সকল নবী ও ফেরেস্তা ঈর্ষান্বিত হবেন।" (এ কথা শুনে) সাহাবার প্রশ্ন করলেন, 'তারা কারা, ইয়া রাসুলুলাহ্ (সাঃ)'? তিনি (সাঃ) উত্তরে বললেন, 'তারা আমাদের (নবীদের) মধ্য থেকেও নয়, তোমাদের (সাহাবাদের) মধ্য থেকেও নয়। তোমরা আমার সঙ্গী, তারা আমার বন্ধু। তারা তোমাদের অনেক পরে আসবে; তারা কুর'আনকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পাবে এবং সুন্নাহকে মৃতাবস্থায় দেখবে। তারা শক্তভাবে কুর'আন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং পুনরুজ্জীবিত করবে। তারা এগুলো অধ্যয়ন করবে এবং মানুষকে এগুলো শিখাবে। একাজে তারা তোমাদের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর ও তীব্রতর নির্যাতনের শিকার হবে। বস্তুতঃ তাদের একজনের ঈমান হবে তোমাদের চলি-শজনের ঈমানের সমান। তাদের একজন শহীদ হবে তোমাদের চলিশজন শহীদের সমান। কেননা তোমরা সত্যের পথে একজন সাহায্যকারীকে [রাসূল (সাঃ)] পেয়েছ। কিন্তু তারা সত্যের পথে কোনও সাহায্যকারী পাবে না। প্রত্যেক জায়গায় তারা অত্যাচারী শাসক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে এবং তাদের অবস্থান হবে বায়তুল মাকদিস (আল-কুদ্স) এর চারপাশে। তাদের জন্য আলাহ্'র পক্ষ থেকে নুসরাহ্ (বিজয়) আসবে এবং তারা এই বিজয়ের গৌরবকে প্রত্যক্ষ করবে।" অতঃপর তিনি (সাঃ) বললেন, "হে আলাহ্! তুমি তাদেরকে নুসরাহ্ (বিজয়) দান কর এবং জান্নাতে তাদেরকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ)